কুহেলিকা

নজরুল ইস্‌লাম

ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট. কলিকাতা

আমার দুর্দ্দিনের বন্ধু—

ডাক্তার কে, এম, এ, হামীদ

করকমলেষু

তুমি দুর্দ্দিনে আশ্রয় মোর, কেবল বন্ধু নহ,
তুমি ভুলায়েছ বন্ধু আমার দুঃখ দুর্ব্বিসহ।
চাহ নাই কিছু, পাও নাই কিছু, অকারণ ভালোবেসে
পরমাত্মীয় সম আসিয়াছ মনের গহন দেশে।
মম সুখ দিনে আস নাই তুমি, আসিয়াছ দুখ-রাতে,
তব প্রীতি-রাঙা অনুরাগ সদা ফিরিয়াছে সাথে সাথে।
কি দিয়া তোমার শুধি ঋণ, মোর সম্বল শুধু লিখা,
দোস্ত্, তোমার দারাজ দস্তে দিনু মোর "কুহেলিকা"

কলিকাতা
১ শ্রাবণ ; ১৩৩৮।

সখ্য-ধন্য—নজরুল ইস্‌লাম

কুহেলিকা

১

লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।......

কবি হারুণ তাহার হরিণ-চোখ তুলিয়া কপোত-কুজনের মত
য়া বলিল,—নারী কুহেলিকা!

নে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা আসলে "মেস্" হইলেও,
হইয়াছে একটি পুরোমাত্রায় আড্ডা।

তিনটি চতুষ্পায়া জুড়িয়া বসিয়া প্রায় বিশ বাইশ জন তরুণ।

একজন—লক্ষ্মীছাড়ার মত চেহারা—একজন ইয়ারের উরু
করিয়া আর একজন ইয়ারের দুই স্কন্ধে দুই পা তুলিয়া দিয়া
রচিত্তে সিগারেট ফুঁকিতেছে। এ আলোচনায় কেবল তাহারই
ৎসাহ দেখা যাইতেছিল না। নাম তাহার—বখ্‌তে-জাহাঙ্গীর
অপেক্ষাও নসিব-বুলন্দ্ দারাজ গোছের একটা-কিছু। কিন্তু
রের দরুণ তাহা এখন আর কাহারও মনে নাই। তাহাকে
পেক্ষা বা আদর করিয়া উল্‌ঝলুল্ বলিয়া ডাকে। এ নাম
প্রথম দিয়াছিল, এখন আর কেহই বলিতে পারে না। এ
ওয়ার গৌরবের দাবী লইয়া বহু বাগবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

হার কায়েম হইয়া গিয়াছে। উল্‌ঝলুল্ উর্দ্দু শব্দ,
', এলোমেলো।

ধন নারীকে 'কুহেলিকা' আখ্যা দিল, তখন কেহ
ানী কাটিল,—শুধু উল্‌ঝলুল্ কিছু বলিল না। এক
ীয়াংশ সিগারেট পুড়াইয়া তাহারি পুঞ্জীভূত ধোঁয়া
া শুধু বলিল,—হুম্!

লতি পড়ে এবং কবিতা লেখার কসরৎ করে। সে
বল না কবি, নারী প্রহেলিকা! বাবা, সাতসমুদ্দুর
য়ও বিবি গুলে-বকৌলির কিনারা করা যায় না! -
রিদিকে ঝটিতি চোখের সার্চ্চ-লাইট বুলাইয়া লইল।
তাহার রসিকতায় রসিয়া উঠিয়াছে। কে... হারুণ
হাসিল।

ার এক রাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত

়েপর আমেজ! আম্‌জাদ অপ্রতিভ ও ক্ষুণ্ণ হইল।
যেন।

তুন বিবাহ করিয়াছে, তাহার বধূ ত্রয়োদশী—
ন্তু এত সাধাসাধি করিয়া এত চিঠি লিখিয়া সে কেবল
উত্তর পাইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক পত্রোত্তর নয়·
ছিল দু'টি লাইন—"রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরি সখা
াধু রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছে! আশ্‌রাফ তাহার বাম
দক্ষিণ হাতের মুষ্টি সজোরে ঠাসিয়া দিয়া বলিল,—

লুল এইবার বেশ জোরেই পূর্ব্বমত শব্দ করিয়া উঠিল—হুম্‌ম্‌!
তা'রি মধ্যে একটু অভিনয়ের কারুণ্যের আমেজ !
ল সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। মনে হইল, এক সঙ্গে এক ঝাঁকা
তন পড়িয়া ভাঙিয়া গেল !
রাফ লাফাইয়া উল্‌ঝলুলের চাঁচর-চুলের গুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ
লিল—এই শালা, অমন কর্‌লি যে ?
ইয়ার্কী ইহাদের মধ্যে প্রায়ই হয়।

লুল ফিরিয়াও দেখিল না। পূর্ব্বের মত সচ্চিদানন্দ হইয়া
গারেট ফুঁকিতে লাগিল।

'ন কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতায় বসিয়া বসিয়া বি-এ ফেল
। ইহারই মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং বিবাহের
র্য্য পরিণাম সন্তান-সন্ততি একটু ঘটা করিয়াই আসিতে সুরু
। রায়হান কিন্তু যত তিত-বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, ততই মোটা
। তবে উদরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পা মাথা মোটাইয়া
উঠিতেছে না। মেসে তাহার আদরের ডাকনাম কুম্ভীর মিঞা।
ঞা কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া যাহা বলিল—তাহাতে মনে
হ তাহার কণ্ঠে অনেকগুলা বাঁশের চ্যাচারি পুরিয়া দিয়াছে !
র হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

লুল এক লম্ফে স্প্রিং-এর পুতুলের মত লাফাইয়া উঠিয়া বসিল।
পর কুম্ভীর মিঞার ভুঁড়ির উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া আবার
ফুঁকিতে লাগিল।

কের রসিক বলিয়া নামডাক আছে। উল্‌ঝলুলের দৃষ্টি লক্ষ্য
লিল,—কি হে, ভুঁড়ি কস্‌ছ না কি ? কত কালি হ'ব বল ত !

বলিল—চোখ দু'টি ক্রমেই যে রকম ঢুলুঢুলু হচ্ছে দিন-কে-দিন, কোথায় শিরাজী টান্‌ছ বাবা? আমরা কি সে ভাঁটিখানার সন্ধান পেতে পারিনে?—ইত্যাদি!

হারুণ তাই বলিয়া মিন্‌মিনে ছেলেও নয়। সে বলিল—অত গোলমাল কর্‌লে বলি কি ক'রে বল। আমার বলা ত তোমরাই ব'লে নিচ্ছ।

কুম্ভীর মিঞা হাঁক্‌ড়াইয়া উঠিল—এই! সব চোপ্‌। বাস্‌, আর একটি কথা কয়েছ কি—ভুঁড়ি চাপা! একেবারে ব্যাং-চ্যাপ্টা!

হারুণ বলিল—নারী শুধু ইঙ্গিত, সে প্রকাশ নয়। নারীকে আমরা দেখি, বেলাভূমে দাঁড়িয়ে—মহাসিন্ধু দেখার মত। তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের যতটুকু দেখা যায় আমরা নারীকে দেখি ততটুকুই। সমুদ্রের জলে আমরা যতটুকু নাম্‌তে পারি, নারীর মাঝেও ডুবি ততটুকুই।···সে সর্ব্বদা রহস্যের পর রহস্যের জাল দিয়ে নিজকে গোপন কর্‌ছে—এই তার স্বভাব।....

হারুণ যেন দিশা হারাইল। মনে হইল, সে যেন চকোরের মত চাঁদের সুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! সে যেন পরীস্থানে শুইয়া ফুল ফোটার স্বপন দেখিতেছে।

সে বলিয়া যাইতে লাগিল—কি গভীর রহস্য ওদের চোখে মুখে! ওরা চাঁদের মত মায়াবী; তারার মত সুদূর। ছায়াপথের মত রহস্য।... শুধু আবছায়া, শুধু গোপন! ওরা যেন পৃথিবী হ'তে কোটী কোটী মাইল দূরে। গ্রহ-লোক ওদের চোখে চেয়ে আছে অবাক হ'য়ে—খুকী যেমন ক'রে সন্ধ্যাতারা দেখে। ওদের হয় ত শুধু দেখা যায়, ধরা যায় না। রাখা যায়, ছোঁয়া যায় না। ওরা যেন চাঁদের শোভা,

চোখের জলের বাদ্‌লা-রাতে চার পাশের বিষাদ-ঘন মেঘে ইন্দ্রধনুর বৃত্ত রচনা করে! দু'দণ্ডের তরে, তার পর মিলিয়ে যায়। ওরা যেন জলের ঢেউ, ফুলের গন্ধ, পাতার শ্যামলিমা; ওদের অনুভব কর, দেখ, কিন্তু ধর্‌তে যেয়ো না।

সকলে মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনিতেছিল। কিন্তু তাহারা শুনিতেছিল, না, সুন্দরকে—কবিকে দেখিতেছিল, বলা দুষ্কর। হঠাৎ উল্‌ঝলুল হারুণের অসমাপ্ত সুরের সহিত সুর রাখিয়া বলিয়া উঠিল,—ঢেউ ধর্‌তে গেলেই জলে ডুব্‌বে। গন্ধ ধর্‌তে গেলেই বিঁধ্‌বে কাঁটা। শ্যামলি গেলেই বাজ্‌বে শাখা। নারী দেবী, ওঁকে ছুঁতে নেই, পায়ের কর্‌তে হয়!...কিন্তু কবি, নারী নায়িকা। ও ছাড়া নারীর আ সংজ্ঞাই নেই।

অনেকেই না বুঝিয়া হাসিল। কেহ মজা অনুভব কি মানে বুঝিল না।

তরিক তাহার রসিক নাম বজায় রাখিবার জন্য দিগ্‌ব হইতে রাজী। সে মুখ বিকৃত করিয়া স্বর কাঁপাইয়া বলিয়া ওরে শালা, তাই তোমার তনু দিনের দিন এমন ক্ষীণ হচে যে নায়ক হ'য়ে ব'সে আছ, তা' কে জানে! তোমার ডিস হ'য়েছে! যাও, শীগ্‌গীর এক শিশি "কুওতে-মেদা" কি ফেলো!

হাসির তুফান বহিয়া গেল!

উল্‌ঝলুল দৃক্‌পাতও করিল না। নির্ব্বিকার চিত্তে পোড়াইয়া ধূম্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

সে বরাবরই এই রকমের।

হারুণ এই সব বাজে হুল্লোড়ে যোগদান করিতেছিল না বটে, তবে সে যে এ-সব উপভোগ করিতেছিল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল।

হারুণ সাধারণতঃ একটু কম কথা বলে, কিন্তু দরকার হইলে এত বেশী বলে যে, তাহা প্রায় বক্তৃতা হইয়া উঠে।

হারুণের ওপর সকলেরই বেশ একটা সহজ শ্রদ্ধা ছিল। সে শুধু কবি বলিয়াই নয়, মানুষ বলিয়া। তাহাকে কেহ কখনো তরল হইতে দেখে নাই।

কাজেই হারুণ যখন উল্‌ঝলুলকে মৃদু হাসিয়া নারী নায়িকা কেন, জিজ্ঞাসা করিল, উল্‌ঝলুল্ তখন তাহার নির্ব্বিকারত্বের বাধুনী একটু শিথিল করিল।

সে বলিল,—আমি জানি, নারী মাত্রেই নায়িকা। ওরা প্রত্যেকে প্রতিদিন গল্প আর উপন্যাস সৃজন ক'রে চলেছে। . তবে বড্ডো বস্তু আঁটুনী—অবশ্য গেরো ফস্কা। কত "চোখের বালি", কত "ঘরে বাইরে", কত "গৃহদাহ", "চরিত্রহীন" সৃষ্টি কর্‌ছে নারী, তার ক'টাই বা তোমাদের চোখে পড়ে কবি।... যে-কোনো মেয়েকে দুটো দিন ভাল ক'রে দেখ, দেখ্‌বে লক্ষ্মী-পক্ষী ইত্যাদি চতুর পুরুষের দেওয়া যত সব বিশেষণ, কোনটাই তাকে মানায় না। তবে, নারী বেচারী সংস্কার আর সমাজের খাতিরে সে যা নয়—তাই হ'বার জন্যে আ-মরণ সাধনা কর্‌ছে। সে যুগ যুগ ধ'রে চতুর পুরুষের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে পুরুষকে খুসী কর্‌ছে। পুরুষ কিন্তু দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং নারীকে শিখাচ্ছে দাঁড় ও ছোলা কলার মহিমা। সমানে সমানে বোঝা-পড়া হ'লে নারীকে দেখ্‌তে শুধু

নায়িকা রূপেই।…তোমরা নারীকে দেখ, সে যা হ'লে ভাল হয়—তাই ক'রে, আর আমাদের মত নীরেট মানুষে দেখে, নারীকে সে যা আছে—তার এক চুলও অতিক্রম না করে'। . তোমরা যারা নারীকে পূজা কর, আমার এ নির্ম্মমতায় হয় ত ব্যথা পাবে, কিন্তু আমি নারীকে পূজা না কর্‌লেও অশ্রদ্ধা করিনে এবং শ্রদ্ধা হয় ত তোমাদের চেয়ে বেশীই করি। কিন্তু তাকে অতিরিক্ত অলঙ্কার পরিয়ে সুন্দর ক'রে—সিঁদুর কঙ্কণ পরিয়ে কল্যাণী ক'রে নয়। আমি সহজ নারীকে, নিরাভরণাকে করি বন্দনা। রাঙ্‌তার সাজ পরিয়ে নারীকে দেবী করবার সাধনা আমার নয়। তিন হাত নারীকে বার হাত শাড়ী পরিয়ে বিপুল ক'রে, বাইশ সের লুৎফুন্নিসাকে হীরা জহরত সোনা-দানা পরিয়ে একমণ ভারাক্রান্ত ক'রে—নারীকে প্রশংসা করার চাতুরী আমার নয়! তোমরা হয় ত চট্‌বে, কিন্তু আমি বলি কি—জান? আমি চাই রূপের মোম্‌তাজকে। তাজমহল দিয়ে মোম্‌তাজকে আড়াল করার অবমাননা আমাকে পীড়া দেয়। আমার ক্ষমতা যদি থাক্‌ত, ওই বন্দনাগার হ'তে মোম্‌তাজকে আমি মুক্তি দিতাম।…কবরের ভিতর যদি শান্তি থাকে, তবে "জাহানারা" "মোমতাজ" বেচারীর চেয়ে অনেকে শান্তিতে আছে। জাহানারার কবরের শষ্প-আচ্ছাদনকে মানুষের অহঙ্কার দলিত করেনি, কোনও পাষাণ-দেউল তার বুকে ব'সে তার বাইরের আকাশ আলো-কে আড়াল ক'রে দাঁড়ায় নি!…

সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল এই আধ্‌-পাগলের প্রলাপ। কে একজন বলিয়া উঠিল, পাগলের পাগ্‌লামীতেও মাঝে মাঝে মানে থাকে হে! উল্‌ঝলুল জোরে জোরে সিগারেট টানিয়া নিমেষে প্রায় দেড়টা সিগারেট পুড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল।—

দেখ, মানুষ যা নয় সেই মিথ্যায় অভিষিক্ত ক'রে তারে খুব শ্রদ্ধা দেখাচ্ছ ব'লে তোমরা খুব বাহবা নিতে পার, কিন্তু আমার শ্রদ্ধা করার ধারা অন্য রকম। মানুষের—তা সে নর হ'ন আর নারীই হ'ন—যা আছে তাই নিয়েই তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার, সম্মান দেখাবার শক্তি ও সাহস আমার আছে। আমার মত্ অন্ততঃ অতটুকু তৈরী হয়েছে।—শয়তান সৃষ্টি করা সত্ত্বেও আমি স্রষ্টাকে সম্মান করি। তোমরা শয়তানের নিন্দা ক'রে স্রষ্টার ওপর "সেন্সার মোশন" আন, প্রকারান্তরে তাঁর সৃষ্টির দোষ ধ'রে সমালোচনা কর—আমি তা করিনে—এই যা তফাৎ। তোমরা নারীকে দেবী ব'লে এই কথাটাই পাকে-প্রকারে স্মরণ করিয়ে দাও, যে, সে—আসলে মানবী—দেবী হ'লেই তাকে মানায় ভাল! নারীকে এ অবমাননা কর্‌বার দুর্ম্মতি আমার যেন কোন দিন না হয়।

তমিজ এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহে নাই। সে অতি মাত্রায় রুচি-বাগীশ। এই জন্য সকলে তাহাকে বে-তমিজ বলিয়া ক্ষেপাইত। তাহার আদর্শ ছিল নামানন্দ ও তুষ্ণীকুমার বাবু। উল্‌ঝলুল্‌কে সে সহিতে পারিত না। সে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল—বাবা পাগলা-গাজী, তুমি থাম! তোমার আর বক্তিমে দিতে হবে না! তোমার মত বিশ্ব-বখাটে ছেলের আদর্শ নিয়ে জগৎ চল্‌ছে না আর চল্‌বেও না।

উল্‌ঝলুল্ হাসিয়া বলিল,—ভাই বে-তমিজ! চট্‌ছ কেন? আমি ত তোমার "সাধারণ ব্রাহ্ম মন্দিরে" বা "দেবালয়ে" গিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিনে। তোমার গুরুর আর তোমাদের মতন আদর্শবাদীর ন্যাকামী আর মিথ্যাচার অসহ্য ব'লেই ত এত ঘা দিই। শয়তানের ওপর আমার

কোনো আক্রোশ নেই, কেননা সে যা—তা সে লুকোয় না, তাকে চিন্‌তে কারুর বেগ পেতে হয় না। কিন্তু ভিতরের কড়া-ক্রান্তি-হিসাব-রত স্বার্থপর মুদিওয়ালা বানিয়াকে যখন বাইরের আচার্য্যের দাড়ি দিয়ে ঢাকৃতে যাও, তখনই আমি আসি ঐ পর্‌দাড়ির মুখোস খুলে তার ভেতরের বীভৎস কদর্য্যতা সকলের সাম্‌নে তুলে ধর্‌তে। অবশ্য, তার জন্য আমাকেও অনেকটা নীচে নেমে যেতে হয়। কিন্তু যাক, তোমার রুচিবিকারের ভণ্ডামী আর ন্থাকামী নিয়ে আলোচনা কর্‌বার যদি দরকার হয় আর এক দিন কর্‌ব। আমাদের যে আলোচনা চল্‌ছিল—তাই চলুক।

হারুণ বলিল,—তুমি কি বল্‌ছ, নারীর আর যত রূপ মিথ্যা? সেবিকা, প্রীতিময়ী—স্নেহময়ী এ সব রূপ তার ছলনা? এ মূর্ত্তি সে নিয়েছে তার পুরুষের স্তুতি আর বন্দনার প্রতিদানে—কিম্বা তা আরো পাবার লোভে? অথবা তাকে এ সাজে সাজিয়েছে ঈর্ষাতুর পুরুষ?—তাকে অবগুণ্ঠন পরিয়েছে পুরুষ, মানি—কিন্তু সে ত তাকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যেই। নারীকে ঘোম্‌টার আড়াল ক'রে দাঁড় করিয়েই ত তাকে পাবার নেশা বাড়িয়ে দিয়েছে হৃদয়ের। এই আড়ালই কাব্য-সৃষ্টি কর্‌ছে। যক্ষকে চিত্রকুটের আড়াল না দিলে কি মেঘদূত এর সৃষ্টি হ'ত? সীতাকে রাবণ হরণ না কর্‌লে কি রামায়ণ পেতাম? দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ কৌরবেরা ক'রেছিল ব'লেই মহাভারতের মহাদানে আমাদের পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছে!

উলঝলুল্ পূঞ্জীভূত ধূম্র নাসিকা ও মুখ-গহ্বর দিয়া উদ্‌গীরণ করিয়া আরো কিছু বলিবার আয়োজন করিতেই চা, গুড়ের সন্দেশ এবং লুচি আসিয়া হাজির হইল।

দেখা গেল, যুবকদের কাছেও নারী অপেক্ষা গুড়ের সন্দেশ অনেক মিষ্টি এবং লুচি ও চা ঢের ঢের প্রিয়। গুড়ের সন্দেশ ও লুচিতে নারী ডুবিয়া গেল। তাহাদের খাইবার ধরণ দেখিয়া মনে হইল, যেন বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অথবা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-ফেরৎ এক দল বুভুক্ষু। কুম্ভীর মিঞা এক গালে এক ডজন লুচি ও এক গালে এক ডজন গুড়ের সন্দেশ পুরিয়া মুখ সঞ্চালনবিদ্যার যে অদ্ভুত আর্ট দেখাইতেছিল, তাহা দেখিয়া কেহ হাসিতেছিল—কেহ ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিবার মক্স করিতেছিল, আর যাহারা রাগিয়া উঠিতেছিল তাহাদেরি মধ্যে একজন খানিকটা নস্য লইয়া কুম্ভীর মিঞার নাকে ঠাসিয়া দিল। কুম্ভীর মিঞা নস্য লইত না। অতএব ইহার পর যে বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা না বলাই ভাল। তাহার মুখ-গহ্বর হইতে লালা-মিশ্রিত সমস্ত লুচি ও সন্দেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় সকলের অঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিল। খাওয়া রহিল পড়িয়া, লাফাইয়া যে যেখানে পারিল পলাইল। কিন্তু কুম্ভীর মিঞার হাঁচি আর থামেনা। হাঁচিতে কাশিতে, লালাতে সিক্নিতে মিশিয়া একটা বিতিকিচ্ছি ব্যাপার হইয়া গেল! বিকচ্ছ ও প্রায়-দিগ্‌বসন কুম্ভীর মিঞার ভুঁড়ি হাঁচির বেগে প্রবল বেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল,—ষ্টীমার পার হইয়া যাইবার পর গঙ্গা-বক্ষের বন্যা যেমন করিয়া দুলিতে থাকে! চক্ষু ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত হইয়া উঠিল। হাঁচি-নিষিক্ত নাসিকা দেখিয়া মনে হইল, যেন কর্ত্তিত খেজুরগুঁড়ি দিয়া রস চোঁয়াইতেছে। কেহ তাহার মাথায় কেহ বা ভুঁড়িতে বদ্‌না বদ্‌না পানি ঢালিতে লাগিল! তরিক "সুরে ইয়াসিন" পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। "সুরে ইয়াসিন" অন্তিম সময়েই শুনাইয়া থাকে এবং "আজান" নামাজের সময় ব্যতীত অন্য সময় দিলে সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে—

কাহারও বাড়ীতে সন্তান হইয়াছে। সুতরাং তরিকের "সুরে ইয়াসিন" পড়াতে যত না হাসির সৃষ্টি হইল, আম্‌জাদ তাড়াতাড়ি কাছা খুলিয়া প্রাণপণ চীৎকারে আজান দিতে সুরু করায় সকলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল!

মোটের উপর, যদি কোন মাতাল এটাকে একটা তাড়িখানা মনে করিয়া ঢুকিয়া পড়িত তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া চলিত না।

এইবার কুম্ভীর মিঞার রাগিবার পালা। রাগাইয়া গালি খাওয়া মুখরোচক বটে, তবে তাহা লুচি ও গুড়ের সন্দেশ নয়। কাজেই তাহা গলাধঃকরণ করিতে অনেকেরই যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। কিন্তু থাক্, আর নয়। মেসে এ-সব ব্যাপার কিছু নূতন নয়।

আড্ডা যখন ভাঙিল, তখন রাত্রি পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

বাবুর্চি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যে যা পারিল দু'টা মুখে গুঁজিয়া দিয়া আপন আপন সিটে লম্বা হইয়া পড়িল।

ঘুম আসিল কি না বলিতে পারি না, কেননা হপ্তা খানিকের মধ্যেই গ্রীষ্মের ছুটি। প্রায় সব কলেজই বন্ধ হইয়া যাইবে।

শুইয়া শুইয়া তরুণেরা গ্রীষ্মের আর পূজার ছুটীর আগে যে-সব কথা ভাবে, তাহা আন্দাজ করিলে—তরুণেরা যাই হউন, রুচি-বাগীশ কুঞ্চিত-নাসিকার দল খুসী হইবেন না. তাঁহারা ভাবিতে পারেন, ছেলেরা সে সময় ভগবৎচিন্তা করে মনে মনে। ইহাও হয় ত বলে—যেন খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়—সে ফজরের নামাজ পড়িবে! তাঁহাদের এরূপ ভাবায় সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু তরুণেরা তাহা ভাবে না। সকলের কথা বলিতে পারি না, তবে অধিকাংশ

তরুণই সে সময় আম-তলা, পুকুর-ঘাট, নদীর-পাড় এবং আনুষঙ্গিক মধুর আরো কিছুর স্মৃতি—এই সবই হয় ত বিশেষ করিয়া ভাবে।

কাজেই ঘুম সে রাত্রে কাহার আসিল জানি না ; অন্ততঃ উল্‌ঝলুল ও হারুণের আসে নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন যে কামরাটি এবং যাহাতে একটী মাত্র সিট ছিল সেই কামরাটিতে উল্‌ঝলুল একা থাকিত। আড্ডা যখন ভাঙিয়া গেল এবং মেস্ শান্ত হইল, তখন হারুণ তাহার তক্তা পাট্‌রা টানিয়া উল্‌ঝলুলের স্বল্পায়তন কামরাটির অবকাশটুকু ভরাট করিয়া ফেলিল। উল্‌ঝলুল প্রায় গোপাল-কাছা হইয়া চিৎপটাং দিয়া শুইয়া ধূম্র-মার্গে বিচরণ করিতেছিল। সে হারুণের তক্তা টানার ঘেসড়ানিতে সচকিত হইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া হারুণের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল দেখিয়া খুব বেশী বিস্মিত হইল বলিয়া মনে হইল না। এক-রাশ উচ্ছৃঙ্খল কেশের গুচ্ছ ললাট হইতে তুলিয়া সে একটু হাসিল মনে হইল। হারুণও তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাসিল।

বাহির তখন শব্দহীন। ক্বচিৎ মোটরের চাকার ঘর্ঘরধ্বনি সেই শব্দহীন অতলতায় নিমেষের জন্য চঞ্চলতার দোলা দিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল,—নিশীথ-রাতে তীরের তরু-শাখা হইতে একটি ছোট্ট ফল পড়িয়া দীঘির নিতলতায় যেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আকাশে অগণিত নক্ষত্র ফেনাইয়া উঠিতেছিল ছায়া-পথের কূলে কূলে। ওরা যেন জোতির্ভ্রমর, আকাশ যেন নীলোৎপল, চাঁদ যেন তাহার পদ্ম-চাকী।

নীরব—নিস্পন্দ জগৎ। রাতের চোখে নিদ্রা যেন জড়াইয়া ধরিয়াছে। এমনি নীরব-নিশীথে যদি হৃদয়ের সান্নিধ্য হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়, তবে সে নিশীথ যেন জীবনে আর না কাটে।

কুহেলিকা

কলিকাতার সকল রাজপথ সকল অলিগলির ধূলা-কাদা পায়ে লাগিয়াছে বলিয়াই হতভাগ্য জাহাঙ্গীর আজ উল্‌ঝলুল নামের বিদ্রূপ-তিলক পরিয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের ভস্মরাশির মধ্য হইতে মানুষকে টানিয়া বাহির করিবার—বাঁচাইবার দুরন্ত সাধনা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে বলিয়া, সত্যকে দর্পণের মত হাতে ধরিয়া দেখিতে চায় বলিয়া সে আজ রুচীবাগীশ নীতি-কচ্‌কচিদের ঘৃণার বক্র ইঙ্গিত সহিয়া যাইতেছে।—হারুণের চোখে জল আসিল। সে কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। সে হঠাৎ উল্‌ঝলুলের পদস্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল—ওগো সত্যব্রত, ওগো বেদনা-সুন্দর, ওগো পাগল, তোমায় সালাম, হাজার বার সালাম করি!—উল্‌ঝলুল তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে!

বাহিরে তাকাইয়া হারুণের মনে হইল, সারা আকাশ বাতাস যেন ঘুমাইয়া চাঁদের স্বপন দেখিতেছে! পবিত্র শান্তিতে তাহার হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া গেল। সে ঘুমের ক্ষীরসাগরে ডুবিয়া গেল।

আকাশ, চন্দ্র ও তারকা সাক্ষী রহিল .....আজ একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভ করিল—শুধু হাসি বদল করিয়া .. ..

ধরা আজ সুন্দর-তর হইল!

২

'মেসে' যা-ই বলিয়া ডাকুক, আমরা উল্‌ঝলুল্‌কে জাহাঙ্গীর বলিয়াই ডাকিব।

জাহাঙ্গীরের পৈতৃক বাড়ী কুমিল্লা জেলায়। তবে সে কলিকাতায় থাকিয়াই মানুষ হইয়াছে। তাহার পিতা ছিলেন কুমিল্লার এক জন বিখ্যাত জমিদার ও মানী লোক। বৎসর চারেক হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সে-ই এখন তাঁহার বিপুল জমিদারীর উত্তরাধিকারী। তবে তাহার মাতা আজও জীবিতা এবং জমিদারী পরিচালনা করেন তিনিই। তাঁহার জমিদারী-পরিচালনের অতি-দক্ষতা দর্শনে লোকে নাকি বলাবলি করে, যে, মেয়েরা সুযোগ পাইলে জমিদারী ত চালাইতেই পারে, কাছা আঁটিয়া ঘোড়ায়ও চড়িতে পারে! তাঁহার শাসনে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল না খা'ক, তাঁহার জমীদারীর বড় বড় রুই-কাত্‌লা ও চুনোপুঁটি এক জালে বদ্ধ হইয়া এক সাথে নাকানি চুবানি খাইয়াছে। হিন্দু প্রজারা তাঁহাকে বলিত "রায়বাঘিনী" এবং মুসলমানেরা বলিত "খাঁড়ে দজ্জাল (খরে দজ্জাল)!"

জাহাঙ্গীরের পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাহার পিতামাতা বৎসরের অধিকাংশ সময় কলিকাতাতেই কাটাইয়াছেন। তাহাদের দু'চারখানা বাড়ীও ছিল কলিকাতায়। কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের মাতা সে সমস্ত ভাড়া দিয়া ছেলেকে বেকার হোষ্টেলে রাখিয়া নিজে জমিদারী দেখিতে কুমিল্লা চলিয়া যান।

কুহেলিকা

জাহাঙ্গীরের ধাতে কিন্তু হোষ্টেলের জেল কয়েদীর জীবন সহিল না। সে হোষ্টেল ছাড়িয়া মেসে আসিয়া আস্তানা গাড়িল।

ইচ্ছা করিলে সে হয় ত আলাদা বাসা বাঁধিয়াই থাকিতে পারিত, কিন্তু কেন যে তাহা করিল না, তাহা তাহার বিধাতাপুরুষই জানেন। সে মাসে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলেও হয় ত তাহার মাতা বিশেষ আপত্তি করিতেন না, তাঁহার অপত্য-স্নেহ এতই প্রবল ছিল; কিন্তু জাহাঙ্গীর কোন মাসে এক শত টাকার বেশী খরচ করিয়াছে, এ বদনাম ষ্টেটের অতি কৃপণ দেওয়ানজিও দিতে পারেন নাই। ইহাতে জাহাঙ্গীরের মাতা খুশীই হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার খাওয়া-পরার অতি মাত্রায় সাদাসিদে ধরণ তাঁহাকে পীড়া দিত। অত বড় ষ্টেটের ভাবী মালিক, সে যদি সংসারে এমনই বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে এবং এমন মুসাফিরি হালে চলাফেরা করে, তবে কাহার জন্য এ পণ্ডশ্রম? কিন্তু ইহা লইয়া পুত্রকে অনুরোধ বা অনুযোগ করা বৃথা। তাঁহার উপরোধে বা আদেশে জাহাঙ্গীর বরং ঢেঁকি গিলিবার চেষ্টা করিবে, তবু তাহার চলাফেরার স্বাধীনতায় হস্তাক্ষপ করিতে দিবে না।

বহু দিন হইতেই জাহাঙ্গীরের চোখে মুখে, চলা ফেরায়, কঠিন জীবন যাপনের মধ্যে মাতা এই বিরস ঔদাসীন্য, বেদানক্ত অশ্রদ্ধা দেখিয়া আসিতেছেন এবং তিনি তাহার কারণও জানিতেন, তাই মা হইয়াও তিনি পুত্রকে দস্তর মত ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি যেন পুত্রের কেউ নন। মাতা-পুত্রের মধ্যে এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীর এখন আর বাহিরের দিক দিয়া সহজে তাহা ধরা পড়িবার অবকাশ দেয় না। সে বলে—কি করব মা, আমার স্বভাবই এই, কিচ্ছু ভাল লাগে না যেন। সে বলে বটে হাসিয়াই, কিন্তু তাহার পীড়িত মনের ছাপ মুখের মুকুরে ধরা পড়ে।

জননী অশ্রু সংবরণ করিয়া উঠিয়া যান। তাঁহার এ দুর্ব্বলতার একটু ইতিহাস আছে। তাহাই বলিতেছি।—

জাহাঙ্গীর যখন জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া সবে মাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে শিখিয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে শুনিল, তাহার মাতা কলিকাতারই একজন ডাকসাইটে বাইজি এবং তাহার পিতা চিরকুমার! সে তাহার পিতামাতার কামজ সন্তান।

সেই দিন হইতে তাহার চোখে সুন্দর পৃথিবীর রং বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনের আনন্দ-দীপালি কে যেন থাবা মারিয়া নিভাইয়া দিয়াছে। সে মানুষের জীবনের অর্থ নূতন করিয়া বুঝিবার সাধনা করিতেছে!

সে তাহার আদর্শবাদের কাচ দিয়া বাসি পৃথিবীকে সাত-রঙা করিয়া দেখিয়াছে, সহজ মানুষকে আপন-মনের মাধুরী দিয়া বিচিত্রতর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু আজ সে উদ্যত-দণ্ড বিচারকের মত নির্ম্মম, সে এই পৃথিবীর বিচার করিবে! সে আজ সৃষ্টিকে তাহার এই বারবিলাসিনীর মত ব্যবসাদারী সাজসজ্জার ভণ্ডামীর জন্য শাস্তি দিবে!

নিষ্ঠুর বজ্রালোকে আজ সত্যের সহিত তাহার মুখোমুখি পরিচয় হইয়া গিয়াছে। আজ সে কঠোর বাস্তব-ব্রতী!.........

৩

তখন স্বদেশী যুগের বান ডাকিয়াছে। ইংরেজ তাহার রাজত্ব ভাসিয়া যাওয়ার ভয় না করিলেও ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কা একটু অতিরিক্ত করিয়াই করিতেছিল। ঘরের ঘটিবাটি সে সামলাইতে ছিল না বটে, কিন্তু বাঁধ সে ভাল করিয়াই বাঁধিতেছিল। জাহাঙ্গীর তখনও বালক,—স্কুলে পড়ে। এমনি দিনে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" মন্ত্রে এই কল্পনা-প্রবণ কিশোরকে দীক্ষা দিলেন তাহারই এক তরুণ স্কুল-মাষ্টার প্রমত্ত। প্রমত্ত যে বিপ্লববাদী, এ ভীষণ সংবাদ স্কুলের কয়েকটি বিপ্লবপন্থী ছাত্র ব্যতীত হয়ত বিধাতা-পুরুষও জানিতেন না। তবে সি-আই-ডি প্রভু জানিতেন কি না, বলা দুষ্কর। বিধাতা-পুরুষে আর সি-আই-ডি মহাপুরুষে এইটুকুই তফাৎ! যাহা পূর্ব্বোক্ত পুরুষের অগোচর, তাহা শেষোক্ত মহাপুরুষের নখদর্পণে!—একদিন একটী ছাত্র গান করিতেছিল—"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে!"

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল,—"এ গান কা'কে উদ্দেশ ক'রে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, জানিস্?" ছেলেটী উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল,—"কেন স্যর, ভগবানকে উদ্দেশ ক'রে!" প্রমত্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"উঁহুঁ, তুই জানিস্‌নে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীমৎ টিকটিকি বাবাজীকে স্মরণ ক'রে ভক্তিভরে এ-গান রচনা করেছিলেন।" ছেলেদের উৎসাহ দেখে কে! সেইদিন হইতে কাহাকেও টিকটিকি বলিয়া সন্দেহ হইলেই, এমন কি দেওয়ালে টিকটিকি দেখিলে, তাহারা তারস্বরে গাহিত,—

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে!"

প্রমত্তকে ছাত্রদের সকলে শ্রদ্ধা করিত, ভালোবাসিত—ভাল শিক্ষক বলিয়াই নয়, সে সকলকে অন্তর দিয়া ভালোবাসিতে জানিত বলিয়া। উঁচু ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্রই তাহাকে প্রমত্-দা বলিয়া ডাকিত।

প্রমত্তের—একা প্রমত্তের কেন, যে কোন বিপ্লবনায়কেরই—কোন কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসার অধিকার কোন বিপ্লববাদীরই ছিল না, তবুও তাহারা প্রমত্তের জাহাঙ্গীরকে "মাতৃমন্ত্রে" দীক্ষা দেওয়া লইয়া একটু চড়া রকমেরই প্রতিবাদ করিল। প্রমত্ত কোন বড়দলের নায়ক ছিল না, তবুও তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবার সাহস বড় বড় বিপ্লব-নায়কদেরও হয়নি। ভবিষ্যতে প্রমত্ত একজন বড় বিপ্লব-নায়ক হইবে, এ-ভয়ও দলের ছোট বড় সকলেই করিত। সুতরাং এ-প্রতিবাদের উত্তর সে তাহারই অধীন বিপ্লববাদীদের না দিলেও পারিত, কিন্তু লোকটি আসলে ছিল একটু বেশী রকমের ভাল-মানুষ। কাজেই নিয়ম-বিরুদ্ধ হইলেও সে ইহা লইয়া বেশ-একটু তর্ক করিল। বলিল—"দেখ, আমাদের অধিনায়ক বজ্রপাণি মহাশয়কে আমি আমার ভগবানের চেয়েও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর এ-মত্‌কে মান্‌তে যথেষ্ট ব্যথা পাই যে বাঙ্‌লার মুসলমান ছেলে বিপ্লববাদীর আদর্শকে গ্রহণ ক'রতে পারে না। অবশ্য, তাঁর স্পষ্ট নিষেধ থাক্‌লে আমি জাহাঙ্গীরকে এ-দলে নিতে পারতাম না—তা সে যত ভাল ছেলেই হোক। তোমরা বল্‌বে, অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই হয় চাকুরী-লোভী, না হয় ভীরু। কিন্তু ওদের সব ছেলেই যে ঐ রকমের, তা বিশ্বাস ক'রবার ত কোন হেতু দেখিনে। তা ছাড়া, আমরা ওদের চেয়ে কম চাকুরী-লোভী, কম ভীরু—এ বিশ্বাস ক'রতে আমার লজ্জা হয়! দেশপ্রেম ওদের মধ্যে জাগেনি—ওদের কেউ নেতা নেই ব'লে। আর, ধর্ম্ম ওদের আলাদা হ'লেও এই বাঙ্‌লারই জলবায়ু দিয়ে ত ওদেরও

রক্ত-অস্থি-মজ্জার সৃষ্টি। যে-শক্তি যে তেজ যে ত্যাগ তোমাদের মধ্যে আছে, তা ওদের মধ্যেই বা থাক্‌বে না কেন? তা ছাড়া আমি মুসলমান ধর্ম্মের যতটুকু প'ড়েছি, তাতে জোর ক'রেই বলতে পারি, যে, ওদের ধর্ম্ম দুর্ব্বলের সান্ত্বনা "অহিংসা পরমধর্ম্ম" কে কখনো বড় ক'রে দেখেনি! দুর্ব্বলেরা অহিংসার যত বড় সাত্বিক ব্যাখ্যাই দিক না কেন, ও-জিনিষটে মুসলমানেরা অভ্যাস করেনি ব'লে ওতে ওদের অগৌরবের কিছু নাই!

আজ-কাল একদল অতিজ্ঞানী লোক বীর-ধর্ম্ম রাজসিকতাকে বিদ্রূপ ক'রে তাদের কাপুরুষতার তামসিকতাকে লুকোবার চেষ্টা কর্‌ছে, কিন্তু আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করি--শুধু কি বুদ্ধ খ্রীষ্ট নিমাই-ই বেঁচে আছেন বা থাক্‌বেন? রাম, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, আলেকজাণ্ডার, প্রতাপ, নেপোলিয়ঁ, গ্যারিবল্‌ডি, সীজার--এঁরা কেউ বেঁচে নেই না থাক্‌বেন না? কত ব্যাস বাল্মিকী হোমার অমর হ'য়ে গেলেন এই গাথা লিখেই। তোমরা হয় ত বল্‌বে, অনাগত যুগে এদের কেউ বড় বল্‌বে না, কিন্তু তোমাদের সে অনাগত যুগ আস্‌তে আস্‌তে পৃথিবীর পরমায়ু ফুরিয়ে যাবে। তা ছাড়া, সাত্বিক ঋষিরা, অহিংস কবিরা অনাগত যুগের অবতারের যে কল্কি বা মেহেদী মূর্ত্তির কল্পনা করেছেন, তাকে ত নখদন্তহীন বলা চলে না। যাক, কি বল্‌তে কি সব বল্‌ছি। ছ্যাখ্, নেংটী-পরা বাবাজীদের এই অহিংসাবাদ আমায় এত আহত ক'রে তোলে যে তখন আর আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না! আমি বলছিলাম কি—"

ইহারই মধ্যে একটী টলষ্টয়-ভক্ত ছেলে বলিয়া উঠিল—"কিন্তু প্রমত্-দা, আমরা মার খেয়েই মারকে জয় ক'র্‌ব—এ কি একেবারেই মিথ্যা?"

প্রমত্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল—"তা হ'লে আমরা বহুদিন হ'ল জয়ী হয়ে গেছি! কারণ, আমরা নির্ব্বিকার চিত্তে এত শতাব্দী ধরে এত মার

খেয়েছি যে, যারা মেরেছে তারাই শেষে দিক্‌শিক মেরে গেছে। আমাদের আর্য্য মেরেছে, অনার্য্য মেরেছে, শক মেরেছে, হূন মেরেছে! আরবী ঘোড়া মেরেছে চা'ট, কাব্‌লিওয়ালা মেরেছে গুঁতো, ইরাণী মেরেছে ছুরি, তুরাণী হেনেছে তল্‌ওয়ার, মোগল পাঠান মেরেছে জাত, পর্ত্তুগীজ ওলন্দাজ দিনেমার ফরাসী ভাতে মার্‌তে এসে মেরেছে হাতে, আর সকলের শেষে মোক্ষম মার মেরেছে ইংরেজ। মার্‌তে বাকী ছিল শুধু মনুষ্যত্বটুকু যার জোরে এত মারের পরও এ-জাত মরেনি—তাই মেরে দিলে ইংরেজ বাবাজি! এত মহামারীর পরেও যদি কেউ বলেন—আমরা এই ম'রে মরেই বাঁচ্‌ছি, তবে তাঁর দর্শনকে আমি শ্রদ্ধা করি—কিন্তু বুদ্ধিকে প্রশংসা করিনে। তাঁর বুদ্ধি-স্থানের ভাল করে চিকিৎসা হওয়া উচিত!—যাক্‌, এ নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। আমি বল্‌ছিলাম, সত্যিই কি আমাদের এ-আন্দোলন থেকে মুসলমানদের বাদ দেবো? ওদের অনেক দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু ওরা সরলবিশ্বাসী ও দুঃসাহসী। ওদের হাতে বাঁশ আছে সত্যি, কিন্তু তা ওরা পেছনে লুকিয়ে রাখ্‌তে জানে না, একেবারে নাকের ডগায় উঁচিয়ে ধরে—এই যা দোষ। ওতে আমাদের কাজ হয় না। ওদের গুপ্তি-মন্ত্রে দীক্ষা দিলে হয় ত ভাবীকালে সেরা সৈনিক হ'তে পার্‌ত।"

প্রমত্ত কি-যেন ভাবিতে লাগিল। মনে হইল, ভাবী কালের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সে ক্ষীণ দীপশিখা লইয়া কি-যেন হাতড়াইয়া ফিরিতেছে!

জাহাঙ্গীরের প্রিয়বন্ধু অনিমেষ বলিয়া উঠিল—"প্রমত্‌-দা, জাহাঙ্গীরকে আমাদের দলে নেওয়ায় অন্ততঃ আমার কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভেবে দেখিনি! তাকে আমি দেখেছি—মানুষ হিসাবে! সে হিসাবে সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়। কিন্তু

এ নিয়ে শেষে আমাদের মধ্যে একটা মনান্তর না বাধে। আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামীকে আজও পেরিয়ে যেতে পারিনি—ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি। এর জন্যে দায়ী আমাদেরি প্রতিদ্বন্দ্বী আর-এক বিপ্লব-সঙ্ঘের অধিনায়ক। আপনি বোধ হয় বুঝেছেন প্রমত দা, আমি কা'কে মনে ক'রে এ-কথা বল্‌ছি!" প্রমত্ত ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিল। অনেকেই সে-হাসির অর্থ বুঝিল না।

অনিমেষ বলিয়া যাইতে লাগিল—"তিনি এবং তাঁর দল কি বলেন, জানেন? বলেন—'আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গী এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে! সন্ধি কর্‌ব লণ্ডন এবং মক্কা অধিকার ক'রে!—তারা মুসলমানকে ইংরেজের চেয়ে কম শত্রু মনে করে না!"

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল,—"আর ঐ অধিনায়ক সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত ক'রে বিলেত ও মক্কা থেকে কি আন্‌বেন—বল্‌তে পারিস্?"

ছেলেরা একবাক্যে স্বীকার করিল, তাহারা বলিতে পারে না।

প্রমত্ত বলিল—"তিনি বিলেত গেলে হ'য়ে আস্‌বেন ট্যাঁস্, খেয়ে আস্‌বেন হ্যাম্, নিয়ে আস্‌বেন মেম! আর মক্কা গেলে হ'য়ে আস্‌বেন হাজী, খেয়ে আস্‌বেন গোশ্‌ত এবং নিয়ে আস্‌বেন দাড়ি! সন্ধি-পত্র আর আন্‌তে হবে না!"

ছেলেরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। প্রমত্ত বলিয়া যাইতে লাগিল—"দেখ্, এই বাঙ্‌লা দেশে গাঁজার চাষ ক'রে গভর্ণমেণ্ট তত সুবিধে করতে পারেনি, যত সুবিধে তাদের ক'রে দিয়েছে আমাদের মহাপুরুষেরা আমাদের মস্তিষ্কে ধর্ম্মের চাষ ক'রে। আমাদের দাঁতের গোড়া ভাঙ্‌বার জন্যে ইংরেজের শিল নোড়া হ'য়ে উঠেছে আমাদের ধর্ম্ম।—ইংরেজের ভারত-শাসনের বড় যন্ত্র কি, জানিস্? আমাদের পরস্পরের প্রতি এই

অবিশ্বাস, পরস্পরের ধর্ম্মে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা! এই ভেদ-নীতিই ইংরেজের বুটকে ভারতের বুকে কায়েম ক'রে রাখ্‌লে—'আদম্‌স্ পিকে' আদমের পদচিহ্ন যেমন অক্ষয় হ'য়ে রইল।"

সমরেশ একটু অতিরিক্ত হিন্দু। সে বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা প্রমত্-দা, মুসলমানকে বাদ দিয়েও ত আমরা স্বাধীন হ'তে পারি।"

প্রমত্ত বলিল—"নিশ্চয়, অনেক দেশই তাদের স্বদেশবাসীর অন্ততঃ বারো আনা লোকের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও স্বাধীন হ'য়েছে; কিন্তু আমরা তা পারব না। কেউ যদি পারে ইংরেজ ও মুসলমানকে একসাথে তাড়াতে, তাড়াক। অন্ততঃ আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে অন্য যে সব দেশ স্বাধীন হ'য়েছে, তারা স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ সহ্য ক'রেছিল—তাদের তাড়াবার পাগ্‌লামী ত তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি যে বিপ্লবাধিপ বলেন—আগে মুসলমানকে তাড়াতে হ'বে, তিনি ভুলে যান যে তাঁর এ অতিক্ষমতা যদি থাকৃতও, তা হ'লেও চতুর ইংরেজ প্রাণ থাকতে তা হ'তে দিত না। যে-দিন ভারত একজাতি হ'বে, সেইদিন ইংরেজকেও বোঁচ্‌কা-পুঁটলি বাঁধ্‌তে হ'বে। এ কথা শুধু যে ইংরেজ জানে তা নয়, রামা শ্যামাও জানে। 'হিন্দু' 'মুসলমান' এই দু'টো নামের মন্ত্রৌষধিই ত ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার রক্ষা-কবচ।····· আমার কিন্তু মনে হয় কি, জানিস? ইচ্ছা কর্‌লে আমরা অনায়াসে এদেশের মুসলমানদের জয় কর্‌তে পারি। তবে তা তরবারি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। অন্ততঃ একটা স্থূল রকমের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে ওদের পরিচিত না ক'রে তুললে, 'কাল্‌চার'-এর সংস্পর্শে না আন্‌লে ওদের জয় কর্‌তে পার্‌ব না। ওদের জয় করা বা স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা মানেই ইংরেজের হাতের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া!"

সমরেশ বলিল,—"কিন্তু প্রমত্-দা, ওদের গোঁয়ার্তুমী আর আবদারের যে অন্ত নেই। মানি, ওরা ইংরেজের হাতের অস্ত্র, আমরা দেশের কিছু কর্‌তে গেলেই মামারা দেবে ওদের লেলিয়ে! কিন্তু উপায় কি? 'কন্‌সেশন্' দিয়ে দিয়ে ওদের তৃতীয় রিপুটাকে প্রচণ্ড ক'রে তোলায় আমাদের যা হবার তা ত হ'বেই, ওদের নিজেদেরও চরম অকল্যাণ হ'বে। ওরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কোনদিনই কর্‌বে না।"

প্রমত্ত—"কন্‌সেশন্ আমিও দিতে বলি নে। আমিও বলি, সমর-যাত্রার অভিযানের সাথী যদি খোঁড়া হয়, তবে তাকে ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে পথে ফেলে যাওয়াই কল্যাণকর। কিন্তু অভিযান ত আমাদের শুরু হয়নি সমরেশ! এটা রিক্রুট্‌মেণ্টের, কাঁচা সৈনিক-সংগ্রহের যুগ—আমরা স্রেফ্ প্রস্তুত হচ্ছি বৈ ত নয়। অনাগত অভিযানের সৈনিক ওরাও হ'তে পারে কিনা—তা পরীক্ষা ক'রে দেখলে আমাদের দেশোদ্ধারের তারিখ এগিয়ে না যাক্, অন্ততঃ পিছিয়ে যাবে না। এখুনই তুমি বল্‌ছিলে ওদের গোঁয়ার্তুমী আর আবদারের কথা। একথা একা তুমি নয়, আমাদের অনেক নেতাই বল্‌ছেন। কিন্তু রোগ নির্ণয় কর্‌লেই ত রোগের চিকিৎসা হ'ল না। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম—ওরা অতি মাত্রায় আবদেরে, ওরা হয় ত ইংরেজ-রাজ্যটাকে মামাবাড়ীই মনে করে। কিন্তু এর মূলে কতদিনের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা পুঞ্জীভূত হ'য়ে রয়েছে—তা দেখেছ কি? সেই কথাই ত বলছিলাম, যে, এইগুলো আমাদের সাধনা দিয়ে তপস্যা দিয়ে দূর কর্‌তে হ'বে। আমাদের ছড়িয়ে পড়্‌তে হ'বে ওদের মধ্যে ওদেরে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে, ওদের রক্তে স্বদেশ-প্রেম জাগিয়ে তোলার জন্যে। দেখ্‌বে, আজ

যারা তোমার প্রতিবন্ধক, কাল সে তোমার সবচেয়ে বিশ্বাসী ও বড় সহযোগী হ'য়ে উঠবে। ওদের ঘৃণা ক'রে ক্ষেপিয়ে না তুলে ভালবেসে দেখ্‌তে দোষ কি ?

সমরেশ—কিন্তু প্রমত্-দা, ওদের মোল্লামৌলবীরা তা কখনো হ'তে দেবে না। জানি না, হয় ত বা ওদের মৌলবী মোল্লা এবং আমাদের ধর্ম্মধ্বজরা ইংরেজের গুপ্তচর। ওরা তখন সাধারণ মুসলমানদের এই ব'লে ক্ষেপিয়ে তুল্‌বে—যে, ওদেরে হিন্দু ক'রে তোলার জন্যেই আমাদের এই অহেতুকী মাথা-ব্যথা। আমাদের এ 'নিরুপাধিক প্রেমচর্চ্চা'কে তারা বিশ্বাস ক'রবে না, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ ক'রবে না।

প্রমত্ত—আমি তাও ভেবে দেখেছি। জানি, মুসলমান জনসাধারণের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হ'বে মোল্লা-মৌলবীর। তাদের রুটী মারা যাবে যাতে ক'রে, তাকে তারা প্রাণপণে বাধা দেবেই। কিন্তু এ ভূতেরও ওঝা আছে,—সে হচ্ছে মুসলমান ছাত্রসমাজ। তরুণ মুস্‌লিমকে যদি দলে ভিড়াতে পারি, তা হ'লে ইংরেজ আর মোল্লামৌলবী এ দুই জেঁাকের মুখেই প'ড়বে চূণ। এই জন্যেই আমি বেছে বেছে মুসলমান ছাত্র নিতে চাই আমাদের দলে এবং এইখানেই আমার সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লব-নেতার বাধে খিটিমিটি।

সমরেশ—আপনার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির প্রশংসা করি প্রমত্‌দা, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই জাহাঙ্গীর ত নয়ই, জাহাঙ্গীরের ভূতও নয়। তারা মনে করে, আমাদের স্বদেশী আন্দোলন মানে হিন্দুরাজের প্রতিষ্ঠা, কাজেই তারা এতে যোগদান করাকে মনে করে পাপ। তারাও সব হা-পিত্যেশ ক'রে তীর্থের কাকের মত আরব কাবুল ইরাণ তুরাণের দিকে চেয়ে আছে—কখন্ ঐ দেশের মিঞা-সায়েবরা এসে ভারত জয়

ক'রে ওদের ভোগ করতে দিয়ে যাবে। ওরা ভুলে যায় নাদির শা' তৈমুরের কথা !

প্রমত্ত—মুসলমানেরা যদি হিন্দুরাজের ভয় করেই, তাতে তাদের বড় দোষ দেওয়া চলে না সমরেশ ! মাতৃ-সমিতির অধিনায়কদের মত্ নাকি হিন্দুরাজেরই প্রতিষ্ঠা। তাদের এ-ভয় আমাদের আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও ত্যাগ দিয়ে দূর কর্‌তে হবে। নইলে পরাধীন ভারতের মুক্তি নেই। মাতৃসমিতির মত আমাদের সঙ্ঘেরও যদি ঐ মত হোত যে মুসলমানকে এ-দেশ থেকে তাড়াতে হবে, তা হ'লে দেশকে যতই ভালোবাসি না কেন, এ-সঙ্ঘে আমি যোগদান ক'রতাম না। মুসলমানদের যদি কোনো দোষ ত্রুটি থাকেই, তবে তার সংশোধনের সাধনা কর্‌ব। তাদের তাড়াবার পাগ্‌লামী যেন আমায় কোনো দিন পেয়ে না বসে। আর, ইরাণ তুরাণের দিকে যে ওরা চেয়ে আছে, তাতে ওদের খুব বেশী দোষ দেওয়াও চলে না। দুর্ব্বল মাত্রেই পরমুখাপেক্ষী। নিজেদের শক্তি নেই, ওরা তাই অন্য দেশের মুসলমানদের পানে চেয়ে তাদের শক্তিহীনতার গ্লানিতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে;—যদিও ওরা নিজেরাই জানে যে ওদের জন্যে ইরাণ তুরাণ আরব কাবুল কারুরই কোনো মাথা-ব্যথা নেই। আমাদের সাধনা হ'বে—ওদের ঐ পরদেশ-মুখী মনকে স্বদেশের মমতা দিয়ে ভিজিয়ে তোলা। যে-মাটী ওদের ফুলে ফলে শস্যে জলে জননীর অধিক স্নেহে লালন পালন কর্‌ছে, সেই সর্ব্বসহা ধরিত্রীর, মূক মাটীর ঋণের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তাদের রক্তে এই মন্ত্র জ্বালা ক'রে ফিরবে যে জননীর স্তন্যপানের যদি কোনো ঋণ থাকে, তবে তারও চেয়ে বড় ঋণ আমাদের দেশ-জননীর কাছে—যার জলবায়ু ও রসধারায় আমাদের প্রাণ মন দেহ

অনুক্ষণ সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌ছে—যে দেশ আমার পিতার জননী, আমার জননীর জননী !···ওদের রক্তে এ-মন্ত্র ইঞ্জেক্ট্‌ কর্‌তে পার্‌বি তোরা কেউ সমরেশ ? সে-দিন ভারতের যে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি আমি দেখ্‌ব, তা আমি আজও দেখছি—আজো দেখছি আমার মানস-নেত্রে ! গা' দেখি সমরেশ, অনিমেষ ! শোনা আমায় সেই সঞ্জীবনী-মন্ত্র ! শোনা সেই গান—

—দেবী আমার, সাধনা আমর, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ !—

প্রমত্ত চক্ষু বুঝিল। তাহার মুদিত চক্ষু দিয়া বিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেরা তাহার পায়ের ধূলায় ললাট ছোঁয়াইয়া গাহিতে লাগিল,—

"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ !"

গাহিতে গাহিতে তাহাদেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

প্রমত্ত সম্মুখে প্রসারিত ভারতবর্ষের প্রাণহীন মানচিত্রকে বারে বারে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে লাগিল !

সমরেশ প্রমত্তের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—"এতদিন আপনাকে ভুল সন্দেহ করছি প্রমত্‌দা, যে, হয় ত মুসলমানের প্রতি আপনার কোনো একটা গোপন দুর্ব্বলতা বা আকর্ষণ আছে। সত্যিই আমরা বিপ্লব-সেনা হ'বার অধিকারী হয় ত আজো হইনি, আজো আমরা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভারতের সকলকে ভালোবাস্‌তে পারিনি। আমাদের দেশ-প্রেম হয় ত স্রেফ্‌ উত্তেজনা, হয় ত ত্যাগের বিলাস। হয় ত আমরা গোঁড়ামীরই রক্ষী-সেনা—ধর্ম্মের নবতম পাণ্ডা। আপনি

ঠিকই বলেছেন প্রমত্‌দা, আমরা কেউই আজও দেশ-সৈনিক হ'তে পারিনি।"

অনিমেষ হাসিয়া বলিল—"ঠিক ব'লেছ সমর, আমরা ধর্ম্মের ষাঁড়—বিপ্লব-দেবতার কেউ নই!"

প্রমত্ত চক্ষু মুছিয়া সিক্ত স্বরে বলিল—"আমার ভারত এ-মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম! আমি তোদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি আমি শুধু ভারতের জল বায়ু মাটি পর্ব্বত অরণ্যকেই ভালোবাসি নাই! আমার ভারতবর্ষ—ভারতের এই মূক দরিদ্র নিরন্ন পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটী মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইণ্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়,—আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে-যুগে-পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ। কত অশ্রু সাগরে চড়া প'ড়ে প'ড়ে উঠ্‌ল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ! ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মস্‌জিদের ভারতবর্ষ নয়,—এ আমার মানুষের—মহা-মানুষের মহা-ভারত!"

৪

স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষা লওয়ার কয়েক মাস পরেই জাহাঙ্গীরের পিতা খান-বাহাদুর ফর্‌রোখ সাহেবের হৃদরোগে মৃত্যু হইল। জাহাঙ্গীব তখন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক, সবেমাত্র সেকেণ্ড্ ক্লাস হইতে ফার্ষ্ট ক্লাসে প্রমোশন পাইয়াছে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার মনে হইল, সে যেন পথ চলিতে চলিতে সহসা এক ইঁদারার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ভয় সে করিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি দিলেন আসিয়া তাহার মাতা—ফির্‌দৌস্ বেগম। আঁখির অশ্রু না শুকাইতেই তিনি সমস্ত ষ্টেট্ পরিচালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। জাহাঙ্গীর পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দে একেবারে ছোট খোকাটীর মত তাহার মায়ের কোলে শুইয়া আদর-আব্‌দারে মা-কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া পুত্রের ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, এ সবকে যে এত ভয় করিস,—আমি মর্‌লে তখন করবি কি বল্‌ত! এত বড় জমিদারী তুই না দেখ্‌লে আমি মেয়ে মানুষ কি একা দেখ্‌তে পারব? পাঁচভূতে হয় ত সব চুরী ক'রে খেয়ে নেবে।" বলিতে বলিতে খান-বাহাদুর সাহেবের ছবির দিকে তাকাইয়া অধর দংশন করিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর সব বুঝিল। তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে পিতাকে একটু অহেতুক ভয় করিলেও ভালবাসিত প্রাণ দিয়া। মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল; মা বারণ করিলেন না, শুধু গাঢ় স্নেহ পুত্রের মাথায় হাত

বুলাইয়া দিতে লাগিলেন—যেন তাহার সমস্ত অকল্যাণ দুই হস্তে মুছিয়া লইবেন ! ··

পিতা-মাতা জাহাঙ্গীরকে যেন অতিরিক্ত সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতেন। জাহাঙ্গীর তাহাকে অতি-স্নেহ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারে নাই। সে কিন্তু এতদিনে এক আধটু বুঝিতেছিল যে, তাহাকে পিতা তাঁহার আত্মীয়দের সাথে মেলা মেশা ত দূরের কথা, দেখা-শুনা পর্য্যন্ত করিতে দিতে নারাজ। তাহাদের দেশ ও জমিদারী কুমিল্লায় —কিন্তু আজো সে কুমিল্লা দেখিল না। ছুটী হইলেই তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ওয়াল্টেয়ার, পুরী, আগ্রা, ফতেপুর, দিল্লী, লাহোর লইয়া ফিরিতেন। জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে কুমিল্লা আসিতে হইলে ফররোখ সাহেব একাই আসিতেন। স্ত্রী-পুত্র কাহাকেও সঙ্গে লইতেন না।

জাহাঙ্গীর ছেলে-বেলা হইতেই একটু পাগলাটে ধরণের। লোকে বলিত, "বড়লোকের ছেলে হ'লেই ইচ্ছা ক'রে ঐ রকম পাগলামী করে রে বাবা! বাপের অত টাকা থাকলে আমরাও পাগল হ'য়ে যেতাম। আদুরে গোপাল, 'নাই' পেয়ে বাঁদর হ'য়ে উঠছে!"—অবশ্য, বলিত তাহারা গোপনেই এবং তাহারা ফররোখ সাহেবেরই কর্ম্মচারী !

বড় লোকের ছেলের পাগলামীর মধ্যে তবু একটা হয়ত শৃঙ্খলা থাকে—মানে থাকে, কিন্তু জাহাঙ্গীরের চলাফেরা বলা-কওয়ার না ছিল মাথা, না ছিল মুণ্ডু। এই হয়ত বাচালের মত বকিয়া যাইতেছে, পরক্ষণেই ধ্যানীর মত অতল নীরবতায় মগ্ন হইয়া গেল। এবং এই রকম নীরব সে দিনের পর দিন থাকিতে পারিত। তাহার এই মগ্নতার দিকটাই প্রমত্তকে এত আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাই সে জাহাঙ্গীরকে বিপ্লবের গোপন মন্ত্রে দীক্ষা দিতে সাহস করিয়াছিল।······

ইহারই কয়েক দিন পর জাহাঙ্গীর ঝটিকা-উৎপাটিত মহীরুহের মত মায়ের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল,—"বল মা, এ কি সত্য ? এ-সব কি শুনি ?"

ফির্‌দৌস্‌ বেগম পুত্রের এই অগ্ন্যুৎদ্গার-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মত ধূমায়মান চোখ মুখ দেখিয়া রীতিমত ভয় খাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি কোন-রূপে শুধু বলিতে পারিলেন,—"কি হয়েছে খোকা ? ও কি, অমন কর্‌ছিস কেন ?"

জাহাঙ্গীর বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—"বাবার ভাগিনেয়রা সম্পত্তির দাবী ক'রে নালিশ করেছে—আমি—আমি—আমি নাকি জারজ পুত্র, তুমি নৃন্না বাইজি—তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী নও—তাঁর রক্ষিতা—আমি খান-বাহাদুরের রক্ষিতার পুত্র!"—কান্নায়, ক্রোধে, উত্তেজনায় জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ ক্ষুব্ধ দীর্ণ হইয়া উঠিল! মুখে তাহার ফেনা উঠিতেছিল, লেলিহান অগ্নিশিখার মত সে জ্বলিয়া উঠিতেছিল! বিদীর্ণ কণ্ঠে সে তাহার জননীর পায়ে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল,—"বল মা, এ মিথ্যা—মিথ্যা! ওরা সব মিথ্যা কথা বল্‌ছে! আমি যে সূর্য্যালোকে আর আমার মুখ তুলতে পারছিনে! মা! মা!"

যাঁহাকে লইয়া এ কেলেঙ্কারী, সেই মা তখন বজ্রাহতের মত কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন! যেন জীবন্ত তাঁহাকে কে পোড়াইয়া দিয়া গিয়াছে! তাঁহার প্রাণ দেহ সব যেন এক মুহূর্ত্তের অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে!

জাহাঙ্গীর ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া তাহার মাতার হাত ধরিয়া প্রচণ্ডবেগে নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল—"বল্—নৈলে খুন ক'র্‌ব তোকে! বল্—তুই

খান বাহাদুরের রক্ষিতা, না আমার মা?”—বলিয়াই সে যেন চাবুক খাইয়া চমকিয়া উঠিল! ও যেন উহার স্বর নয়, ও-স্বর উহার পিতার, ও-রসনা যেন ফররোখ সাহেবের! তাহার মাঝে তাহার পিতাকে এই সে প্রথম অনুভব করিল! হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর বিচারকের মত তীব্র দৃষ্টি দিয়া মাতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অভিভূতা মাতা শুধু করুণ কাতর চক্ষে পুত্রের পানে চাহিয়াছিলেন!

জাহাঙ্গীর আর একটীও কথা না বলিয়া মন্ত্র-ত্রস্ত সর্পের মত মাথা নোয়াইয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। চলিতে চলিতে তাহার মনে হইতে লাগিল, ধরণী যেন তাহার চরণদ্বয় গ্রাস করিতেছে—যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্প হইতেছে—দানবী ধরা এখনই বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া পিষিয়া চিবাইয়া মারিবে!

যাইতে যাইতে শুনিল, মুমূর্ষু ভিখারিণী যেমন করিয়া ভিক্ষা মাগে, তেমনি করিয়া তাহার মাতা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিতেছেন,—“ফিরে আয়, ফিরে আয় খোকা, ফিরে আয়!”

জাহাঙ্গীরের প্রাণ যেন তাহারই প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিল—“ওরে হতভাগিনী! হয় ত জাহাঙ্গীর আবার ফিরবে, কিন্তু তোর খোকা আর ফিরবে না!”

সে সোজা প্রমত্তের বাসার অভিমুখে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে সে কেবলি আপনার মনে বলিতে লাগিল,—“ওগো ধরিত্রী মা, আজ হ’তে আমি তোমার ক্লেদাক্ত ধূলি-মাখা সন্তান—এই হোক আমার সব চেয়ে বড় পরিচয়! আজ হ’তে আমি মানব-পরিত্যক্ত নিখিল লজ্জিত নরনারীর দলে!...ওগো সর্ব্বসহা মা, যে বুকে কোটী কোটী ভ্রূণ-হত্যার শিশুদের নিয়ে দোলা দিয়েছ—সেই বুকে নিয়ে আমায়

দোলা দাও, দোলা দাও! যে-স্পর্দ্ধায় কুমারীর পুত্রকে করেছ মহাবীর, মহর্ষি, পয়গম্বর—সেই স্পর্দ্ধার অক্ষয় তিলক আমায় পরাও মা!”...

জাহাঙ্গীর যখন উন্মত্ত মাতালের মত প্রমত্তের বাসায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন মৃত দিবসের পাণ্ডুর মুখ সন্ধ্যার কালো কাফন দিয়া ঢাকা হইতেছে। সান্ধ্য আজান-ধ্বনি তাহারি “জানাজা” নামাজের আহ্বানের মত করুণ হইয়া শুনাইতেছিল। মাথার উপর দিয়া চীৎকার করিতে করিতে ক্লান্ত বায়স উড়িয়া চলিতেছিল—যেন মৃত দিবসের শবযাত্রী। ম্লান আকাশের আঙিনায় শুধু একটী তারা ছলছল করিতেছিল ক্ষীণ করুণ কিরণে—যেন সদ্য পুত্রহীনার চোখ!

প্রমত্ত জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া ভয় খাইয়া গেল। সে নিজেদের বিপদের কল্পনা করিয়া বলিয়া উঠিল,—“কি রে, কোনো খারাব খবর আছে না কি?” জাহাঙ্গীর বলিল, “আছে,”—বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে অর্গল দিয়া দিল।

বস্তীর মধ্যে খোলার ঘর। যতদূর পরিষ্কার রাখা যায় স্যাঁৎসেঁতে নোংরা ঘরকে, তার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই; তবু তাহার দীনতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে—ঘসা মাজা বিগত যৌবনের মত। ক্ষীণ মৃৎপ্রদীপালোকে দেখা যাইতেছে শুধু একটী ছিন্ন অজিনাসন ও ভারতের ম্লান মানচিত্র। ধূপ-গুগ গুলের ধোঁয়ায় আর ভিজে মাটির গন্ধে মিশিয়া ঘরের রুদ্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে।

প্রমত্ত উদ্বেগ-আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল,—“কোথায় কি হয়েছে, বল্ ত!”

জাহাঙ্গীর বিরস-কঠোর কণ্ঠে বলিল,—“দেশসেবার পবিত্র ব্রত আমায় দিয়ে হ’বে না প্রমত্ত-দা।”

প্রমত্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"যাক, যা ভয় কর্‌ছিলাম, তার কিছু নয় তা হ'লে!—আবার কার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌লি?"

জাহাঙ্গীর বলিল,—"বিধাতার সঙ্গে!—আমি এ পবিত্র ব্রত নিতে পারি না প্রমত্-দা! না জেনে নিয়েছিলাম, তার জন্যে যা শাস্তি দেবেন দিন্। আমার রক্ত অপবিত্র,—আমি জারজ পুত্র!" শেষ দিকে জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ বেদনায় ঘৃণায় কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল।

প্রমত্ত চমকিয়া উঠিল! তাহার পর গভীর স্নেহে জাহাঙ্গীরকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "যা ভয় ক'রেছিলাম, তাই হ'ল।···যাক, ওতে তোর লজ্জার কি আছে বল্‌ত। যদি লজ্জিতই হ'তে হয় বা প্রায়শ্চিত্তই ক'রতে হয় ত তা ক'রেছে ক'রবে বা ক'র্‌ছে তারা, যারা এর জন্যে দায়ী। কোন অসহায় মানুষই ত তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়।"—জাহাঙ্গীর যেন পথহারা অন্ধকারে কাহার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ পাইল—তাহাই সে বজ্রমুষ্টিতে ধরিতে চায়।

সে খাড়া হইয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—"সত্যি বল্‌ছেন প্রমত্-দা? আমি তা হ'লে নিষ্পাপ? পিতার লালসা, মাতার পাপ আমার রক্ত কলুষিত করেনি? ক'রেছে, করেছে! আজ আমি তার পরিচয় পেয়েছি। আমার মাঝে আজ প্রথম আমি আমার পশু-পিতাকে দেখ্‌তে পেয়েছি! দেখুন প্রমত্-দা, আমি জীবনে কখনো কু-কথা উচ্চারণ করিনি, কিন্তু আজ আমি এক নারীকে পিতার রক্ষিতা ব'লে গালি দিয়ে আমার রসনা কলঙ্কিত ক'রেছি;—সে নারী আমারই জন্মদাত্রী! না প্রমত্-দা, আমার প্রতি-রক্তকণা অপবিত্র—আমার অণু-পরমাণুতে আমার পিতার কুৎসিত ক্ষুধা, মাতার দূষিত প্রবৃত্তি কিল্‌বিল্ ক'রে ফিরছে বিছের বাচ্ছার মত—যে কোন মুহূর্তে তা

আত্মপ্রকাশ কর'তে পারে আজকের মত। আপনার মহান যজ্ঞে আমার আত্মদান দেবতা গ্রহণ করতে পারেন না প্রমত্-দা। পাপের যূপকাষ্ঠে আমার বলি হ'য়ে গেছে!" জাহাঙ্গীর হাঁপাইতে লাগিল—মনে হইল, এখনই বুঝি তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে।

প্রমত্ত শান্ত দৃঢ় স্বরে বলিল,—"আমাদের মন্ত্র তুমি ভুলে যাচ্ছ জাহাঙ্গীর। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' আমাদের ইষ্টমন্ত্র। জননী জন্মভূমির বিচার করবার অধিকার আমাদের নেই!"—শেষ দিকটা আদেশের মত শুনাইল।

জাহাঙ্গীর লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল,—"মিথ্যা ও মন্ত্র! ও মন্ত্র মিথ্যা! জননী নয় জননী নয়,—শুধু জন্মভূমিই স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

প্রমত্ত জাহাঙ্গীরকে মায়ের মায়ের মত বুকে করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল,—"পাপ যদি তোর থাকেই জাহাঙ্গীর, দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে তোকে খাঁটি ক'রে নেব,—তুই কাঁদিস্‌নে!"

জাহাঙ্গীর তখনো চিত্র-ভারত বুকে ধরিয়া উপুড় হইয়া কাঁদিতেছিল,—"শুধু তুমি, জন্মভূমি আমার, শুধু তুমি একা স্বর্গাদপি গরিয়সী,—আর কেউ নয়, আর কেউ নয়!"

বুকের তলায় চিত্র-ভারত অশ্রু-সিক্ত হইয়া উঠিল!

৫

গ্রীষ্মের ছুটী হইয়া গিয়াছে। ছাত্রদের যৌবনোন্মুখ মন অকারণ সুখে কাণায় কাণায় পুরিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আজ তাহাদের সুদূর পল্লীর নব মুকুলিত আম্র-বীথির গন্ধ-স্বপন দেখিতেছে।

হারুণ বাড়ী যাইবার জন্য সমস্ত গুছাইয়া তাহার খালি তক্তাপোষের উপর শুইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছিল। তাহার দেশের ট্রেণ ছাড়িবার তখনো পাঁচ ছয় ঘণ্টা দেরী। পশ্চাৎ হইতে কাহার কেশাকর্ষণে চমকিয়া উঠিয়া সে দেখিল, জাহাঙ্গীর ওর্ফে উল্‌ঝলুল্‌ দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছে। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, তোমার ট্রেণ কয়টায় হারুণ?

হারুণ মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন তুমিও যাবে নাকি আমার সাথে?

জাহাঙ্গীর পকেট হইতে দুইখানা টিকিট বাহির করিয়া দেখাইল, সে আগেই শিউড়ি পর্য্যন্ত দুইখানা টিকিট করিয়া রাখিয়াছে।

হারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ সে কণ্ঠে করুণ আবেদন ঢালিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু তোমার ত সেখানে যাওয়া হ'তে পারে না ভাই।

জাহাঙ্গীর গম্ভীরভাবে হাঁই তুলিয়া দুটা তুড়ি মারিয়া আলস্য-জড়িত স্বরে বলিল, তুমি জাননা হারুণ, আমার যাওয়া হবেই, তোমার যদি না-ই হয়।

হারুণ তাহার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি জান না জাহাঙ্গীর সে কী রকম অজ্-পাড়া গাঁ। সেখানে চাম্চিকের মত মশা—

হারুণ আর কিছু বলিবার আগেই জাহাঙ্গীর কৃত্রিম ভীত স্বরে বলিয়া উঠিল,—বাদুড়ের মত মাছি, বন্যবরাহের মত ইঁদুর, হারুণের মত বাঁদর! এই ত, না আর কিছু?

হারুণ হতাশ হইয়া বলিল, সত্যি ভাই লক্ষীটি! তুমি কিছু মনে ক'রোনা। সেখানে তোমার অসুবিধার একশেষ হবে! সর্ব্বপ্রথম ত, শিউড়ি থেকে পাঁচটি কোশ পথ "শ্রীচরণ মাঝি ভরসা" ক'রে পাড়ি দিতে হবে! মাঝ রাস্তায় বক্রেশ্বর নদী—

জাহাঙ্গীর নিশ্চিন্ত আরামে সিগারেট টানিতে টানিতে বলিল, সে বৈতরণীতে তরণী নাই, কর্ণধার নাই, ভীষণ স্রোত, স্রোতে ভীষণ হাঙ্গর কুম্ভীর, তিমি, সর্প, এই ত? কিন্তু আমি জানি হারুণ, এ সবের একটাও নেই সেখানে। আর যদি থাকেও তবে—

"আল্লা আল্লা বইল্যা রে বাই নবী কইর‍্যা সার, নাজা বাইন্দ্যা চইল্যা যাইবাম্ ভব নদীর পার!" বুঝ্লে? অদৃশ্য কর্ণধারকে একেবারে অষ্ট-রম্ভা দেখিয়ে গোপাল-কাছা হয়ে উস্পার!

হারুণ এইবার একেবারে হা'ল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল। বন্ধু তাহার বাড়ী যাইবে, ইহাতে সে আনন্দিত যেমন হইতেছিল, তেমনি তাহার অসোয়াস্তির আর অন্ত ছিল না তাহার বাড়ীর দুরবস্থার কথা ভাবিয়া। উপবাস অবশ্য সেখানে করিতে হইবে না, কিন্তু জাহাঙ্গীরের মত এত সুখে লালিত পালিত জমিদার-পুত্রকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিবার মত সম্বলও তাহাদের নাই। এই দৈন্যের স্মৃতিই তাহার

মনকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। অসহায়ের নিষ্ফল ক্রন্দনের বাষ্পে তাহার আঁখি বারেবারে করুণ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের এই অকপট বন্ধুত্বের সরলতায়, এই আত্মীয়তার দাবীতে তাহার কবি-মন ভিজিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে "মরিয়া হইয়া" চেষ্টা করিতেছিল, জাহাঙ্গীরের কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না, কিন্তু এখন আর সে প্রতিবাদ করিল না। উল্টো, কেমন এক খুশীতে তাহার সারা মন যেন অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। তাহার কল্পনা-প্রবণ হৃদয় সকল-কিছু ত্রুটী অভাবকে রঙীন করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সুদূর পল্লী-নীড় যেন তাহার সকল অভাব অপূর্ণতার জন্যই বেশী করিয়া সুন্দর মনে হইতে লাগিল। তাহার স্বাভাবিক বিষণ্ণ মুখ খুশীতে প্রভাতের কমলের মত সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গীর ইচ্ছা করিয়াই অতি সাধা-সিধে গোটা কতক জামা কাপড় লইয়া একটা ছোট বেতের বাক্সে ভরিল। তাহার পর দুইজনে এক সঙ্গে স্নান আহার সারিয়া ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল। হ্যারিসন রোড ও কলেজষ্ট্রীটের জংশনে ট্যাক্সি আসিতেই জাহাঙ্গীর কি মনে করিয়া হঠাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। ট্যাক্সিওয়ালাকে সেই খানে থামিতে বলিয়া হারুণের দিকে তাকাইয়া বলিল, "এখ্‌খুনি আসছি।" বলিয়াই সে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট অভিমুখে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে যখন সে মস্ত একটা তোরঙ্গ নিজেই ঘাড়ে করিয়া আসিল, তখন হারুণ যেন কোথায় কোন্ স্বপ্ন-লোকে হারাইয়া গিয়াছে। জাহাঙ্গীর তোরঙ্গটা ট্যাক্সিতে দিয়া ট্যাক্সি-চালককে যখন যাই তে বলিল, তখনও হারুণ তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া কী যেন ভাবিতেছে।

জাহাঙ্গীর হারুণের বাহুতে এক রাম-চিমটি দিয়া গম্ভীর ভাবে অন্য-দিকে মুখ ফিরাইয়া সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

হারুণ প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, উঃ! এ কি! তুমি এলে কখন? বলিয়া বাহুতে হাত বুলাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গীর উদাস স্বরে বলিল, জগতে শুধু কবির স্বপ্নই নাই কবি, অ-কবির রাম-চিম্‌টিও আছে!

হারুণ হাসিয়া বলিল, এর পরেও যদি তাতে সন্দেহ প্রকাশ করি, তা হ'লে হয়ত তুমি ট্যাক্সি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বল্‌বে, যে, কবির স্বপ্ন-লোকের চেয়েও সত্যি এই মাটীর পৃথিবীটা এবং ঐ মাড়োয়ারী-কণ্টকিত ফুট-পাথ্‌টা!

হঠাৎ হারুণ দেখিতে পাইল ট্যাক্সি হাবড়া ষ্টেশনের দিকে না যাইয়া বাগবাজারের দিকে ছুটিতেছে। সে একটু চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল, ওহে জাহাঙ্গীর, এ যে বাগবাজারে এসে পৌছলুম আমরা। এখানে হাবড়া ষ্টেশন পাওয়া যায় না কি?

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল—না, এখানে পাওয়া যায় চণ্ডু আর রসগোল্লা!

হারুণ হাসিয়া বলিল, বুঝেছি! তুমি আজকাল ঐ প্রথম চিজ্‌টা একটু বেশী ক'রেই টান্‌ছ মনে হচ্ছে!

ট্যাক্সি এক সন্দেশের দোকানের সামনে আসিয়া থামিতেই জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, দেখ্‌লে! ট্যাক্সিরও রসবোধ আছে! বলিয়াই সে নামিয়া পড়িল।

হারুণ হতাশ হইয়া বলিল, আজ ষ্টেশনে ব'সে ব'সে ঐ মিষ্টিই খেতে হবে। ট্রেণ আর পাওয়া যাচ্ছে না।...

কুহেলিকা

গ্রীষ্মের রৌদ্র-দগ্ধ মধ্যাহ্ন...

উল্কাবেগে মাঠ ঘাট প্রান্তর বাহিয়া চলিয়াছে ট্রেণ। সুখে আলসে হারুণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শুধু জাহাঙ্গীর জানালার বাহিরে মুখ রাখিয়া রৌদ্র-প্রতপ্ত আকাশের চোখে চোখ রাখিয়া চাহিয়া আছে। ট্রেণের প্রচণ্ড গতিবেগকে ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার মন ঐ তাপ-দগ্ধ আকাশের পানে। সে যেন আকাশের ঐ তপ্ত ললাটে ললাট রাখিয়া তাহার ললাটের জ্বালা অনুভব করিবে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য তখন আগুন বৃষ্টি করিতেছে। তপ্ত চুল্লীর সম্মুখে বালিকা-বধূর মত ধরণী এলাইয়া পড়িয়াছে।

জাহাঙ্গীর দুই হাত তুলিয়া ললাটস্পর্শ করিয়া মধ্যাহ্ন-দিনের সূর্য্যকে নমস্কার করিল। তাহার চক্ষু জলে টইটুম্বুর হইয়া উঠিল। সেই অশ্রু-সিক্ত চক্ষু সূর্য্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া সে আপন মনে বলিতে লাগিল, জানিনা বন্ধু, তোমার বুকে কিসের এ জ্বালা! কোন্ অভিমানে তুমি পুড়াইয়া মারিতেছ এই শান্ত ধরণীকে! আমার এ-বুকে তোমারই মত জ্বালা বন্ধু। কিন্তু সে জ্বালায় জ্বলিয়া আমিও কেন তোমার মত মধ্যাহ্ন-দিনের সূর্য্য হইয়া উঠিনা? কেন আমার জ্বালা তাহার জ্বালার সাথে আলোও দান করিতে পারেনা?

ছুট্! ছুট্! ওরে যন্ত্ররাজের দুরন্ত শিশু! ছুট্ তুই আরো—আরো—আরো বেগে! নিয়ে চল্ একেবারে ঐ সূর্য্যের বহ্নি-পিণ্ডের বুকে! চল্—চল্—ওরে ধরার ধূমকেতু! চল্ ঐ জ্বালা-কুণ্ডের হাম্মাম-সিনানে! ঝাঁপাইয়া পড়্, যেমন করিয়া কোটি কোটি উল্কাপিণ্ড ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে ঐ জ্বালা-কুণ্ডে!
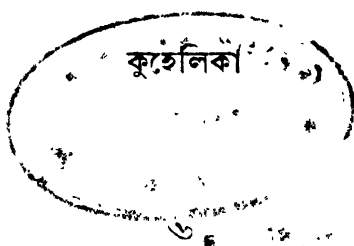
শিউড়ি যখন তাহারা পঁহুছিল, তখন রাত্রি বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে।

হারুণ বলিল, এখন কি করা যায় বল ত। এখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবে, না শহরে যাবে! শহরে আমার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় আছেন, যদি তোমার মত্ হয় সেখানেও যেতে পারি।

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাড়ীর চেয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ ঢের বেশী সোয়াস্তিকর হারুণ। ব্যাস্! খোলো গাঁঠেরি! এমন চাঁদনী-রাত, প্লাট্ফর্মে শুয়ে দিব্যি রাত্তির কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আর, যদি বল রাত্তিরেই তোমার বক্রেশ্বর পাড়ি দিতে হবে, তাতেও রাজি।

হারুণও হাসিয়া বলিল, বেশ, সেই ভাল। কিন্তু প্ল্যাট্ফর্মের কাঁকরগুলো সারা রাত্তির হয় ত পিঠের সঙ্গে রসিকতা করবে।

জাহাঙ্গীর তোরঙ্গটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, কাঁচকলার কবি তুমি! এমন চাঁদ্নী-রাতের চাঁদোয়ার তলে শুয়েও যে পিঠের তলার কাঁকর গুলোকে ভুলতে পারে না, সে হচ্ছে—কী বলে ইয়ে—এই—পাটের দালাল!

হারুণ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ কী রকম উপমাটা হ'ল?

জাহাঙ্গীর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, ড্যাম্ ইওর উপমা! তোমার ঐ উপমার লেস বুনুনী দিয়ে মানুষের মোক্ষলাভ হবে না! যত সব কুঁড়ের আস্তাকুঁড়!

হারুণ বলিল, কিন্তু এই কুঁড়ের আস্তাকুঁড়েই পদ্মফুল ফোটে জাহাঙ্গীর!

জাহাঙ্গীর সিগারেটের মুখাগ্নি করিতে করিতে বলিল, সে আস্তাকুঁড়ে নয় কবি, সে ফোটে তোমাদের ঐ মাথার গোবরে! কিন্তু ও কাব্যালোচনা এখন চুলোয় যাক, এ সিগারেটের ধোঁয়ায় ত আর পেট ভরবেনা। পেটের ভিতর যে এদিকে বেরাল আঁচড়াচ্ছে। তুমি এই সব পাহারা দাও, আমি চল্‌লাম খাদ্যান্বেষণে।

হারুণ কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে এক দাব্‌ড়ানীতে থামাইয়া দিয়া জাহাঙ্গীর চলিয়া গেল। হারুণ নিরুপায় হইয়া প্ল্যাট্‌ফর্মে পরিপাটি করিয়া বিছানা পাতিয়া গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মের স-চন্দ্রা যামিনী। তাপ-দগ্ধ আকাশের নীল দেহে কে যেন গোপী-চন্দন অনুলিপ্ত করিয়া দিয়াছে। রৌদ্র-দগ্ধ দিবস, রাত্রির শীতল কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাঁদীর মত তরুর সারি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবলি বীজন করিতেছে।

আবেশে তন্দ্রায় হারুণের চক্ষু জড়াইয়া আসিল। এই দুঃখের, অভাবের, ধূলার পৃথিবী তাহার স্বপ্নে অপরূপা হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ইহার হাসি যেমন মায়াবী, ইহার অশ্রুও তেম্‌নি যাদু জানে। এই মায়াবিনীকে তাহার একটী ক্ষীণাঙ্গী বালিকার মত করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করিল!

হঠাৎ জাহাঙ্গীরের রাম-ঠেলায় সচকিত হইয়া হারুণ উঠিয়া বসিয়া দেখিল, জাহাঙ্গীরের "খাদ্যান্বেষণ" ব্যর্থ হয় নাই। শিউড়ির যাহা কিছু ভাল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সে তাহার সব কিছুই চ্যাঙাড়ি ভর্তি করিয়া আনিয়াছে।

হারুণ বলিল, শিউড়ির খবর আমার চেয়ে তুমিই বেশী রাখ দেখছি। তুমি শহরে গিয়ে বুঝি এই সব কাণ্ড ক'রে এলে? কিন্তু এই সব খেয়ে শেষ করতে হ'লে সকাল পর্য্যন্ত খেতেই হবে, ঘুম টুম বাদ দিয়ে।

জাহাঙ্গীর বলিল, আচ্ছা, আরম্ভ ত করা যাক, তারপর তোমার কপাল আর আমার হাতযশ!

খাওয়া শেষ হইলে জাহাঙ্গীর একা প্লাটফর্মে অন্যমনস্কভাবে পদ-চারণা করিতে লাগিল। হারুণ জাহাঙ্গীরের এই অন্যমনস্কতায় বিস্মিতও হইল না, ব্যাঘাতও জন্মাইল না। অনেককেই সে বলিতে শুনিয়াছে, জাহাঙ্গীরের মাথায় ছিট আছে। সে ইহা বিশ্বাস করে নাই। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বন্ধুত্ব তাহার যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সে আপনার চোখ ও মন দিয়া যতটুকু দেখিয়াছে, তাহার অধিক জানিবার মত অতি-কৌতূহল তাহার কোনোদিনই জাগে নাই। তাহার স্বভাবই এই। তাহা ছাড়া সে ইহাও মনে করে যে, যে স্বেচ্ছায় যতটুকু পরিচয় দেয়, তাহার অধিক জানিতে চেষ্টা করা খুব সুমার্জ্জিত রুচির পরিচয় নয়। সে বলিত, কৌতূহল জিনিসটাই কদাকার। যাহা কেহ নিজে বলিতে চাহে না, তাহার উপর জুলুম করা বর্ব্বরতারই কাছাকাছি। জাহাঙ্গীরকে যখন আর সকলে পাগল, মনে করিত, তখন কেবল হারুণই ইহার পাগ্‌লামীর, ইহার ছন্নছাড়া জীবনের মূলে কোনো সুগভীর বেদনা-উৎসের সন্ধান করিত। মানুষের বেদনাকে সে অশ্রদ্ধা করিতে শিখে নাই। তাই জাহাঙ্গীরের বেদনার উৎস-মূল জোর করিয়া খুঁড়িয়া তোমার এশ্বরিতে চাহে নাই।

দব কুঁড়ের আমীরের ইতিহাস সে ত জানেই না, অন্য ছাত্ররাও জানে না।

জাহাঙ্গীরের পিতার মৃত্যুর পর যখন তাহার পিস্‌তুত ভায়েরা সম্পত্তির দাবী করিয়া নালিশ করিল, তখন তাহার বুদ্ধিমতী জননী এ কেলেঙ্কারী বেশীদূর গড়াইবার পূর্ব্বেই কি করিয়া যে ইহা চাপা দিয়া ফেলিল, তাহা দুই চারিজন ছাড়া কেহই জানিতে পারিল না। অবশ্য, ইহার জন্য তাহাদের বিপুল জমিদারীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ আয় কমিয়া গেল। তাহার পিস্‌তুত ভায়েদের অবস্থা অত বড় মামলা চালাইবার মত স্বচ্ছল ছিল না; কাজেই তাহারা এত সহজে অভাবনীয়রূপে যে সম্পত্তি পাইল, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সমস্ত দাবী পরিত্যাগ করিল। এমন কি, তাহারা আদালতে স্বীকারও করিল যে, জাহাঙ্গীর সত্য সত্যই খানবাহাদুরের বিবাহিত পত্নীর পুত্র। ইহা লইয়া "রায় বাঘিনী" জমিদারনীর প্রতাপে জমিদারীতে কাণাঘুসা ও হইতে পারিল না। কাজেই এ ব্যাপার অনেকের মনে মনে ধোঁয়াইলেও আগুন হইয়া দেখা দিল না। জাহাঙ্গীরের মনও ধূমে বিষাক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু একেবারে দগ্ধীভূত হইল না। এই সান্ত্বনাটুকুই তাহার জীবনে বড় সম্বল হইয়া রহিল। এতদিন হয়ত সে সত্যই পাগল হইয়া যাইত, অথবা আত্মহত্যা করিত, শুধু স্বদেশ-উদ্ধারের মন্ত্রই তাহাকে বাঁচিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার দগ্ধ জীবনকে প্রদীপ শিখা করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে। মরিতেই যদি হয়, জন্মের অপরাধকে জীবনের জ্যোতিতে জ্যোতির্মহিমান্বিত করিয়া সে মরিবে!

জাহাঙ্গীর যখন তন্ময় হইয়া পায়চারি করিতেছিল, তখন হারুণ আস্তে আস্তে উঠিয়া ষ্টেশন হইতে শহরে একটু বেড়াইতে গেল। এই বেদনাতুর জাহাঙ্গীরকে সে যেন সহ্য করিতে পারিত না। তাহার এই মূর্ত্তি সে যখনই দেখিয়াছে, তখনি তাহার বুক ব্যথায় মোচড় খাইয়া উঠিয়াছে।

আজও সে সহিতে না পারিয়াই সরিয়া গেল। জাহাঙ্গীরের সম্মুখ দিয়াই সে চলিয়া গেল, কিন্তু জাহাঙ্গীর একটী কথাও বলিল না। এমন কি, তাহাকে দেখিয়াছে বলিয়াও মনে হইল না। কোন্ বেদনার আবর্ত্তে পড়িয়া সে তখন হাবুডুবু খাইতেছিল, তাহা তাহার অন্তর্যামী ছাড়া কেহ জানিল না।

অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে চলিতে হারুণ যখন শহরে আসিয়া পড়িল, তখনও সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায় নাই। সম্মুখে এক মনোহারীর দোকান দেখিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, টাকার অভাবে সে তাহার ভাই বোনদের জন্য কলিকাতা হইতে তেমন কিছু আনিতে পারে নাই। জাহাঙ্গীর জোর করিয়া তাহাকে টিকিট কিনিতে দেয় নাই। রাস্তায়ও তাহার কোনো খরচ হয় নাই। ইহাতে তাহার যে চার পাঁচটী টাকা বাঁচিয়াছে, তাহা দিয়া সে তাহার ভাই বোনদের জন্য সাবান, চিরুণী, ফিতা গন্ধতেল প্রভৃতি কিনিল। ঐ কয়টী টাকায় যাহা ক্রয় করিল, তাহা তাহার মনঃপূত হইল না। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার দুইচক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মন খুশীতে ও বেদনায় ভরিয়া উঠিল একটা কথা স্মরণ করিয়া। জাহাঙ্গীরের তোরঙ্গটা সে প্রথমে দেখে নাই, কিন্তু দেখা অবধি তাহার আর জানিতে বাকী নাই, যে, জাহাঙ্গীর তাহার ভাই বোনদের জন্যই কাপড় চোপড় কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। অত খাবার যে সে একটু আগে লইয়া গিয়াছে, —তাহার অর্থও সে বুঝিল। ইহাতে সে তাহাদের অভাবের সংসারে লালিত ভাই বোনগুলির জন্য যেমন খুশী হইয়া উঠিল, তেমনি—বন্ধুর নিকট হইলেও—এই আত্মীয়তাকে কিছুতেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মন কেবলি বলিতে লাগিল, জাহাঙ্গীর এই

পাগলামী করিয়া আমাদের দুর্দ্দশার কথাটা স্মরণ না করাইয়া দিলেই ভাল হইত। ব্যথায় তাহার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে যখন প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও জাহাঙ্গীর তেমনি পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। সে কিছু না বলিয়া শুইয়া পড়িল। এই উন্মাদকে দেখিয়া তাহার মনের অনেকটা জ্বালা শান্ত হইয়া আসিল। ইহার বিরুদ্ধে তাহার মন যেটুকু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার কবি-মনের করুণ সহানুভূতিতে প্রীতিতে ধুইয়া মুছিয়া গেল।

আজ তাহার প্রথম মনে হইল, জাহাঙ্গীর শুধু তাহার চেয়ে দুঃখীই নয়,—তাহার চেয়েও সে দরিদ্র, সে সর্ব্বহারা!

৭

ভোর না হইতেই একটা দুরন্ত কোকিলের ডাকে হারুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সারারাত্রি সে নেশাখোরের মত ঘুমাইয়াছে, পাশ পর্যান্ত ফিরে নাই। কত সুখের কত বেদনার যে-সব স্বপন সে সারা-রাত্রি ভরিয়া দেখিয়াছে, তাহার আবেশ যেন তখনো তাহার আঁখি পাতায় জড়াইয়া আছে।

উন্মুখ যৌবনের অভূতপূর্ব্ব সুখের পীড়ায় তাহার সারা দেহ মন তখন চড়া-সুরে বাঁধা বীণার মত টন্‌টন্ করিতেছিল। তাহার রক্তে রক্তে মহুয়া মদের নেশার মত কি যেন একটা পুলক রিণিরিণি করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে তাহার কবিতার ডালি সাজায় সেই হাওয়া-পরীকে আজ সে চায় না, আজ এই কোকিল-ডাকা দক্ষিণা-বাতাস-বহা গ্রীষ্মপ্রভাতে সে চায় সেই মাটির মানবীকে—যাহার মধ্যে তাহার সমস্ত কবিতা নিঃশেষ হইয়া যাইবে।...

হঠাৎ তাহার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। জাহাঙ্গীর তখনো সমানে পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। সে জাহাঙ্গীরের নিকটে গিয়া দেখিল, তাহার দুই চক্ষু জবাসঙ্কাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নিশি-শেষের পাণ্ডুর গ্যাসের আলো পড়িয়া তাহার মুখ ভীষণ করুণ দেখাইতেছিল। অত্যন্ত প্রিয়জনকে স্বহস্তে হত্যা করিবার পর হত্যাকারীর মুখ চোখ যেমন হয় তেমনি।

হারুণের কবি-মন হেরেমের কিশোরীর মত, বন-মৃগীর মত ভীরু, স্পর্শালু। কঠিন রূঢ় কোনো কিছুর স্পর্শ সে সহিতে পারে না। মারামারি তো দূরের কথা, কোথাও কলহ দেখিলেও সে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, তার সকল দেহ মন বিস্বাদ ভয়ে ও হতাশায় একেবারে এলাইয়া পড়ে। সে সকল অন্তর দিয়া প্রার্থনা করে, জিজ্ঞাসা করে বিধাতাকে, কেন এই কলহ, কেন এই কুৎসিৎ সংগ্রাম, কেন এই অশান্তি! করে মানুষ মানুষ হইবে! খোদা, ইহাদের শান্তি দাও! ইহারা তোমার সুন্দর সৃষ্টিকে ভয়াবহ করিয়া তুলিল! তোমার ধরণীর পুষ্পকুঞ্জ মত বারণের মত ইহারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল!...

আজও সে জাহাঙ্গীরের এই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া ভীত শুষ্ক কণ্ঠে কোনো রকমে শুধু বলিতে পারিল, "জাহাঙ্গীর!" সে আর কিছু বলিতে পারিল না। সমস্ত শরীর অজানা শঙ্কায় বেতস-পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। জাহাঙ্গীর চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "একি! হারুণ?" বলিয়াই চারিদিকে চাহিয়া লইয়া সলজ্জ অপ্রতিভ স্বরে বলিল, ভোর হয়ে গেছে বুঝি? খুব ভয় পেয়ে গেছ তুমি, না? ও কিছু নয়, এমন আমার প্রায়ই হয়!

হারুণ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, তুমি সারা রাত জেগে পায়-চারি করেছ? আর আমি ষাঁড়ের মতন প'ড়ে প'ড়ে আরাম ক'রে ঘুমিয়েছি।

জাহাঙ্গীর বাম করে হারুণের কণ্ঠ মালার মত জড়াইয়া ধরিয়া শান্ত-স্বরে বলিল, তাতে হয়েছে কি ভাই! চল আমরা বেরিয়ে পড়ি এই সময়। বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাবে। কেমন? তুমি সব

গুছোও. আমি ষ্টেশনের যে দুটো কুলিকে ঠিক ক'রে রেখেছি আমাদের এই বোচকা পুঁটুলি নিয়ে যাবার জন্যে, ওদের খুঁজে বের করি ততক্ষণ।

জাহাঙ্গীর চলিয়া গেল। হারুণ মন্ত্রমুগ্ধের মত বিছানাপত্র গুছাইতে গুছাইতে ভাবিতে লাগিল জাহাঙ্গীরের এই অপূর্ব্ব আত্মসংযমের মাধুর্য্য। হত্যাকারীর মত ভীষণ রুক্ষ মুখ কেমন করিয়া চক্ষের পলকে এমন সুন্দর সহজ হাসিতে ভরিয়া উঠিতে পারে, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না। সহসা তাহার মনে হইল, এই বেদনার এই দুঃখের বন্ধু জাহাঙ্গীর কাহাকেও করিতে চায় না—যতবড় অন্তরঙ্গ বন্ধু হোক সে, তাহাকেও জাহাঙ্গীর তার গোপন বেদনা-মন্দিরের সন্ধান বলিবে না। এইখানে সে একা—একেবারে একা! অমা-নিশীথিনীর অন্ধকারও সে রহস্যের সে বেদনার অন্ধকার পথে পথ না পাইয়া ফিরিয়া আসিবে!......

জাহাঙ্গীর যে এমন মিলিটারী-ষ্টাইলে এত জোরে—এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে পারিবে, হারুণ তাহা মনে করে নাই। কাজেই সারাটা রাস্তা জাহাঙ্গীরের সাথে প্রায় দৌড়াইয়া সে যখন তাহার স্বগ্রামের প্রান্তে আসিয়া পঁহুছিল, তখন আর থাকিতে না পারিয়া সে বলিল, দোহাই ভাই, এই গাছতলায় একটু জিরিয়ে নিতে দাও! আর পারছিনে! বাপ্! তুমি এতদিন ডাক-হরকরা হওনি কেন? হাঁটা ত নয়, এ যেন হণ্টন-প্রতিযোগিতার দৌড়! হারুণ বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গীর একেবারে শুইয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধনেত্রে গাছের দিকে চাহিয়া বলিল, কী সুন্দর ভাই তোমাদের এই দেশ! পূর্ব্ববঙ্গের মত একেবারে নিরবকাশ গাছ-পালার ভিড় নাই। খানিকটা মাঠ, খানিকটা

তেপান্তরের মত শূন্য ডাঙা, খানিকটা বন জঙ্গল, দূরে দূরে গ্রাম, ক্ষীণাঙ্গী নদী—আমার কি ভালোই লাগছে তা বলতে পারছিনে। কলকাতায় ইঁটের পাঁজা থেকে বেরিয়ে গায়ে যেন একটু সুন্দর পবিত্র বাতাস লাগল! এমনি একটী ছোট গাঁয়ে তোমার ঐ বক্রেশ্বর নদীর ধারে যদি আমার একটা কুটীর থাকত, তা হ'লে সারাদিন ঐ রাখাল ছেলে গুলোর সাথে গরু চরিয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম!

তাহার জন্মভূমির এই প্রশংসায় হারুণের বুক গর্ব্বে খুশীতে ভরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু অকারণে জলে পুরিয়া উঠিল। সেই অশ্রু-পরিপূর্ণ দুই চক্ষুর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা-আর্দ্র দৃষ্টি লইয়া হারুণ তাহার পল্লী জননীর পানে চাহিয়া রহিল। গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু জলও বুঝি বা গড়াইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার এই গাঁয়ের পথের মাটী দুই হাতে অঞ্জলি পুরিয়া মাথায় মাখিয়া পবিত্র হইয়া লয়! লজ্জায় তাহা পারিল না, পার্শ্বেই জাহাঙ্গীর শুইয়া। সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, জাহাঙ্গীর! সামনের পুকুরটাতে পা হাত ধুয়ে নাওনা ভাই। তোমার যে বুক পর্য্যন্ত ধূলো উঠেছে দেখছি! সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু তোমায় এই ধূলোর গেরুয়া রঙে রাঙা হয়ে। তুমি যেন ঘর-ছাড়া বাউল! মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়া সে জাহাঙ্গীরের উচ্ছৃঙ্খল কেশ বেশ দেখিতে লাগিল!

পুকুর পাড়ের একটা অর্জ্জুন গাছের ডালে যে সুন্দর নীল পাখীটা বসিয়াছিল, জাহাঙ্গীর তাহারই দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। এত সুন্দর পাখী সে আর কখনো দেখে নাই। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, না হারুণ, তোমাদের দেশে মাস খানিক থাকলে আমি একেবারে কবি বনে যাব! এত দেশ থাকতে কেন তোমাদেরই দেশে জয়দেব চণ্ডীদাস জন্ম নেন, তা অনেকটা বুঝছি।

সে আবার শুইয়া পড়িয়া বলিল, না ভাই। এ ধূলো আর ধুচ্ছিনে পথে। বাঙলার পথের ধূলো, আমার জন্মভূমির বেদনাতুর পথিকের পায়ের ধূলো—ও শুধু বুক পর্য্যন্ত কেন, মাথা পর্য্যন্ত উঠ্‌লে আমি ধন্য হ'য়ে যেতাম! পবিত্র ধূলো কি অত তাড়াতাড়ি মুছ্‌তে আছে ভাই?

বলিয়াই দিগন্ত-প্রসারী মাঠের দিকে তাকাইয়া বলিল, দেখ কবি, আমি কবিতা টবিতা ভাল বুঝিনে! গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক আমি। কিন্তু আমার আজ এই মাঠের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, এর চেয়ে ভাল কবিতা তোমাদের কোনো কবিই লিখে যেতে পারেন নি। এই মাঠের ঘাসের ছন্দোবদ্ধ লাইনের বন্ধনে কখনো সবুজ কখনো সোনার রঙে যে কবিতা লেখা হয়, তার কি তুলনা আছে! ঐ কৃষকের লাঙলের চেয়ে কি তোমাদের কালি-ভরা লেখনী বেশী ফুলের ফসল ফলাতে পারে? ঐ মাঠের খাতায় নিরক্ষর কবির সৃষ্টির কাছে তোমাদের জগতের সব চেয়ে বড় কবি কি তাঁর পুঁথির বোঝা নিয়ে দাঁড়াতে পারেন?

হারুণ দুই চক্ষে বিস্ময় ভরিয়া জাহাঙ্গীরের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কি সেই কঠোর বাস্তব-ব্রতী বস্তু-বিশ্বের পূজারী জাহাঙ্গীর? কিন্তু ইহা লইয়া সে প্রশ্নও করিল না। উহাকে সে কোনো দিনই বুঝিতে পারে নাই, আজও পারিল না। সে অন্যমনস্কভাবে বলিল, সত্যি ভাই, এরাই সত্যিকার ফুলের কবি, আমরা কথার কবি। আমরা যখন ঘরের আঁধার কোণে ব'সে মাকড়সার মত কথার জাল বুনি, এরা তখন সারা দেশকে ফুলের ফসলে সুন্দর রঙীন ক'রে তোলে! এদের শ্রমেই ত ধরণীর এত ঐশ্বর্য্য-সম্ভার, এত রূপ, এই যৌবন!

জাহাঙ্গীর বলিল, তাই ভাব ছি হারুণ, এত বিপুল শক্তি এত বিরাট প্রাণ নিয়েও এরা প'ড়ে আছে কোথায়! এরা যেন উদাসীন আত্ম-ভোলার দল, সকলের জন্য সুখ সৃষ্টি ক'রে নিজে ভাসে দুঃখের অথই পাথারে। এরা শুধু কবি নয় হারুণ, এরা মানুষ! এরা সর্ব্বত্যাগী তপস্বী দরবেশ! এরা নমস্য।

জাহাঙ্গীর দুই হাত তুলিয়া সসম্ভ্রমে মস্তকে ঠেকাইল। হারুণের চোখ শ্রদ্ধায় বেদনায় বাষ্পাতুর হইয়া উঠিল! এই সেই প্রভাতের হত্যাকারীর মত ভয়াবহ জাহাঙ্গীর!

কুলি দুইজন এইবার উঠিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিল। জাহাঙ্গীর উঠিয়া কুলির মাথা হইতে হারুণের বোচকা ও নিজের বেতের বাক্সটা হাতে লইয়া বলিল, চল। হারুণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জাহাঙ্গীর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, অন্যায় করেছি বন্ধু একজন মানুষের বোঝা আমারি মত আরেকজন মানুষের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমরা এসে পড়েছি। অর্থ দিয়ে কি মানুষের হাতের সেবার, তার শ্রমের প্রতিদান দেওয়া যায়? এখন এই রাস্তাটুকু ওদের শুদ্ধ কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে গেলেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না!...মানুষের একটা নূতন বেদনার দিক দেখতে পেলাম আজ। এতদিন বইএর পাতায় যাকে দে'খেছি, আজ চোখের পাতায় তার দেখা পেলাম!...

হারুণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। জাহাঙ্গীরের তাহার সাথে আসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাস্তায় চলা পর্য্যন্ত যে-সব ব্যাপার সে দেখিল, যাহা কিছু শুনিল, তাহাতে তাহার মধ্যে তাহার সমস্ত চিন্তা সমস্ত-কিছু

যেন একটা তাল পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিঃশব্দে অভিভূতের মত পথ চলিতে লাগিল।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুই একটী বাড়ীর পরেই তাহাদের জীর্ণ খোড়ো ঘর। হারুণ ঘরের দুয়ারে আসিয়া পঁহুচিতেই তাহার দুইটী বোন্ ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের ধূলা লইল। তাহারা তাহাদের আনন্দের আতিশয্যে হারুণের পিছনে জাহাঙ্গীরকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ তাহার দিকে চোখ পড়িতেই তাহারা জিভ কাটিয়া ছুটিয়া পলাইল।

হারুণ বাহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া ভাঙা তক্তপোষে বিছানা পাতিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেই জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, দোহাই হারুণ, তোমার ভদ্রতা রাখ! তুমি নিরতিশয় অতিথি পরায়ণ, মেনে নিলাম। তুমি আগে তোমার বাবা মা ভাই বোনের সাথে দেখা শুনা ক'রে এস।

হারুণ হাসিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় তাহার মা আলুথালুবেশে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া বলিতে লাগিলেন, "খোকা এসেছিস? খোকা এসেছিস্? আমার জন্যে পাল্‌কি এনেছিস্? মিনার জন্য সাইকেল এনেছিস? মিনা যাবে সাইকেলে, আমি যাব পাল্কীতে—ভুই গোরস্থানে! মিনার সাইকেল! মিনা!" বলিয়াই আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন!

হারুণের জননী উম্মাদিনী। হারুণের আর একটী ভাই ছিল, হারুণের চেয়ে দু'বছরের বড়। ডাক নাম ছিল তার—মিনা। তের বৎসর বয়সে সে মারা যায়। তাহার পরেই তাহার মাতা পাগল হইয়া যান। তাহার পিতারও কিছুদিন আগে বসন্ত হয়, তিনি কোনো রকমে বাঁচিয়া যান, কিন্তু দুইটী চক্ষু চিরজন্মের মত অন্ধ হইয়া যায়।

মৃত্যুর সময় মিনা বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কেবলি কাঁদিয়াছিল, "আমি সাইকেল চড়ব, আমায় সাইকেল কিনে দাও!" দুর্ভাগিনী মাতা পাগল হইয়া গেলেও "মিনা" আর "সাইকেল"এই দুটী কথা ভুলিতে পারেন নাই!

হারুণের দুইটি বোন ও ছোট ভাইটীর—এই পাগলিনী মাতা ও অন্ধ পিতাকে লইয়া যে কি করিয়া দিন কাটে, তাহা ভাবিয়া জাহাঙ্গীরের শরীরের রক্ত হিম হইয়া যাইতে লাগিল! অথচ হারুণ একদিনও তাহার এই অসহায় অবস্থার কথা তাহার কাছে বলে নাই।

হারুণ তাহার মাতাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর আর থাকিতে না পারিয়া আগাইয়া আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "মা, ভিতরে চলুন।"

মাতা তাহার দিকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, মিনা এসেছিস? অ্যাঁ? তোর সাইকেল কই? আমার পালকি কই?

হারুণ ও জাহাঙ্গীর ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। জাহাঙ্গীর চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মাতা ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, মিনা চলে গেলি? ও খোকা? মিনাকে ধর্ ধর্! পালালো, পালালো!

জাহাঙ্গীর চলিয়া আসিতেছিল দেখিয়া হারুণের দুই বোন আসিয়া মাতাকে ধরিয়াছিল, কিন্তু মায়ের এই ক্রন্দনে জাহাঙ্গীর ফিরিয়া আসিতেই তাহারা আবার উঠিয়া পলাইল। হারুণ একটু রাগিয়া বলিয়া উঠিল, এ-সময় অত বিবি হ'তে হবে না তোদের! এ আমার বন্ধু জাহাঙ্গীর। আমাকে দেখে যদি লজ্জা না করিস্ ত জাহাঙ্গীরকেও লজ্জা কর্‌বার কিছু নেই।

এইবার তাহারা কোনো রকমে জড়সড় হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। হারুণ কি ইঙ্গিত করিতেই তাহারা দুই বোন জাহাঙ্গীরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিল। জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, কী দোওয়া করব? রাজ-রাণী হও না অন্য কিছু? বলিয়াই দেখিল ঘোমটার আড়াল হইতে এক জোড়া উজ্জ্বল সুন্দর চক্ষু ভোরের তারার মত তাহার দিকে চাহিয়া আছে জাহাঙ্গীরের বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে চোখ ফিরাইয়া লইল! মাতা তখন অনেকটা শান্ত হইয়াছেন। জাহাঙ্গীরের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বলিতেছিলেন, মীনা! বাবা আমার! তুই আর যাস্‌নি। আমি সাইকেল কিনে দেবো।

৮
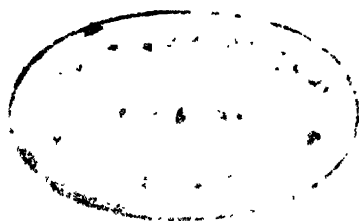
পর দিন অসহ্য গরমে অতি প্রত্যুষেই জাহাঙ্গীরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়াই বাহিরবাটী হইতে হারুণকে চীৎকার করিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। হারুণ ঘুম-বিজড়িত চক্ষে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে জাহাঙ্গীর? কিছু হয়েছে নাকি?

জাহাঙ্গীর বলিল, আরে তৌবা, তোমাদের দেশটা দেখছি জ্যৈষ্ঠি বুড়ীর একেবারে উনোনের পাশ! কাল রাত্তির থেকে সকাল পর্য্যন্ত আমার অন্ততঃ তিন কলসী ঘাম ঝরেছে! বাপ!

হারুণ হাসিয়া ভাল করিয়া কাছাটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, আমি ত সেই জন্যেই কাল ভিতরে গিয়ে শুতে চাইনি। তোমার কাছে থাকলে অন্ততঃ খানিকক্ষণ পাখা করতে পারতাম। বলিতে বলিতে হারুণের কাছা আবার খসিয়া পড়িল!

জাহাঙ্গীর হাসিয়া উঠিল। প্রভাতের আকাশের মত খোলা প্রাণের হাসি, সুন্দর, উজ্জ্বল! বলিল, বন্ধু, তোমার "ব্যাক-টাই"টা আগে ভাল করে এঁটে নাও গিয়ে; আমি বরং ততক্ষণ একটু সাঁতার কাটি তোমাদের ঐ এঁদো পুকুরটাতে!—বলিয়াই জাহাঙ্গীর তাহার বেতের বাক্সটা খুলিয়া চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া ষ্টোভটা জ্বালাইয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া তোয়ালে সাবান লইয়া পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হারুণ সস্মিত আননে তাহার সাঁতার কাটা দেখিতে লাগিল।

সাঁতার কাটিতে কাটিতে জাহাঙ্গীর বলিল, হারুণ পানিটা গরম হয়ে গেলে তোমার বোনকে দিয়ে একটু চা-টা তৈরী ক'রে নিও ভাই। চা দুধ চিনি সব ঐ বাক্সে আছে। দোহাই! তুমি তৈরী করতে যেয়োনা যেন! সব ভণ্ডুল করবে তা' হ'লে!—বলিয়াই জাহাঙ্গীর একডুবে মাঝ পুকুর হইতে ঘাটে আসিয়া চুল গুলো পিছন দিকে সরাইয়া বলিয়া উঠিল,—হারুণ, তখন বলছিলে, রাত্রে আমার কাছে থাকলে খানিকক্ষণ পাখা করতে পারতে, না? তা হ'লে যেটুকু ঘুম আমার হ'য়েছিল, তাও হ'ত না! বাপ্! পাশে শুয়ে একটা মদ্দ মিন্সে পাখা করছে দেখ্লে ঘুম বেচারী ঘোম্টা টেনে তিন লাফে ঘর ছেড়ে পালাত! পুরুষের সেবা—উঃ সে কী ভয়ানক! ভাদ্দর বৌকে ভাসুর সেবা করতে এলে তার যেমন অবস্থা হয়, তেমনি আর কি!

হারুণ এইবার একটু জোরেই হাসিয়া ফেলিল। বলিল, দোহাই ভাই, ঐ দুঃখে তুমি জলে ডুবোনা যেন! আমি কোন দিনই তোমার সেবা করতে যাচ্ছিনে। চা-টা "ভূণী"কেই করতে বলছি। তবে সেও আমার চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ নয়।

তাহার কথার অর্থ অন্যরূপ দাঁড়াইল দেখিয়া জাহাঙ্গীর একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল। তবে সে তোখড় ছেলে, সহজে মুস্ড়াইয়া যায় না। বলিল, তা হোক্‌গে, মা খাবার না রেঁধে যদি বাবা ও কর্ম্মটা করতেন, তা' হ'লে এর অনেকটা স্বাদ ক'মে যেত হে! বলিয়াই জাহাঙ্গীর আবার সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল।

হারুণ বাড়ীতে গিয়া তাহার বোন 'ভূণী'কে হাসিতে হাসিতে বলিল, ওরে ভূণী, জাহাঙ্গীর ষ্টোভে চা চড়িয়ে নাইতে গেছে। তুই চা-টা একটু তৈরী ক'রে রাখ্ গিয়ে। চা, দুধ, চিনি, কাপ, চামচ সব

ঐখানেই আছে। ওর ঐ একটা দোষ, কোথাও যাবার সময় চায়ের সরঞ্জাম সাথে না নিয়ে যায় না!

ভূণী জাহাঙ্গীরের বোন দু'টার মধ্যে বড়। বয়স পনর পার হইয়া গিয়াছে। দেখিতে কিন্তু আরো একটু বেশী বয়সের বলিয়াই মনে হয়। চমৎকার জ্বল্‌জ্বলে চোখ মুখ। সমস্ত শরীরে প্রখর বুদ্ধির দীপ্ত জ্যোতি যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সে তাহার ভ্রাতার আদেশে বাহির বাটীতে যাইতে একটু ইতস্ততঃ করিল। ও ঘর হইতে পুকুরটা একেবারে সাম্‌নে। তা'ছাড়া সে ভাল চা করিতেও জানে না। বাড়ীতে ও পাঠ একেবারেই নাই।

হারুণ বুঝিতে পারিয়াই একটু দুষ্টুমী করিয়া বলিল, ওরে ভূণী, জাহাঙ্গীর বলেছে, তুই—এই - তোরা কেউ চা তৈরী ক'রে না দিলে ও কিছুতেই খাবে না। পুরুষ লোকের সেবা আর রান্না জিনিসের উপর ওর ভয়ানক আক্রোশ! আমি চা করলে ও হয় ত তা আমার মুণ্ডুতেই ঢেলে দেবে।

ভূণী যাইতেছিল, আর তাহার যাওয়া হইল না। সে লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল, আমি যেতে পারব না. মোমিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভূণীর ছোট বোন মোমি আজও দ্বাদশীর চাঁদ। ভূণীর মত আজো সে ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া ওঠে নাই। সে কাছেই দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল এবং তাহার চোখে মুখে দুষ্টুমীর হাসি দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল যে, সে এই ব্যাপারের রহস্যটুকু রীতিমত উপভোগ করিতেছে।

এদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরেও "দিদি"কে পূর্ব্ববঙ্গের মত "আপা" না বলিয়া "বুবু" বলিয়াই ডাকে।

তাহার বুবুর কথা শুনিয়া মোমি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, ইস্! আমি যেতে গেছি আর কি! তোমায় ডেকেছেন, তুমি যাও!

ভূণী কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল,—এই মোমি! যা তা বললে তোমার পিঠে চ্যালাকাঠ ভাঙ্‌ব কিন্তু!

হারুণ হাসিয়া বলিল, নে আর ঝগড়া কর্‌তে হবে না। চল, আমরা তিন জনেই যাই। আমি ব'সে থাক্‌ব, তোরা চা কর্‌বি।

মোমি খুশী হইয়া উঠিল। ভূণী কিন্তু একটু সলাজ সঙ্কোচেই গেল।

বাহির বাড়ীতে যাইয়া ভূণী পুকুরের দিকে চাহিতেই জাহাঙ্গীরের সাথে চোখাচোখি হইয়া গেল। জাহাঙ্গীর চোখ নামাইয়া লইল। ভূণী কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও চোখ নামাইতে পারিল না। রাত্রি বেলায় বন-হরিণীর চোখে শিকারীর ফ্লাশ-লাইটের জ্যোতির্ধারা গিয়া পড়িলে সে যেমন মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই আলো হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না, তেমনি করিয়া ভূণী জাহাঙ্গীরের অনাবৃত সুঠাম সুডোল বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিয়া রহিল। ইচ্ছা করিয়াও চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। ইহা যে লজ্জার, ইহা যে অন্যায়, ইহা সে ভাবিবার অবকাশ পর্য্যন্ত যেন পাইল না।

জাহাঙ্গীরের বিরাট বক্ষ স্নানের শ্রমে ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, শরীরের সমস্ত মাংসপেশী পরিপূর্ণরূপে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সে এইবার ঘাটে পিছন ফিরিয়া বসিয়া—সাবান মাখিতে মাখিতে স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল, তাহার পৃষ্ঠে একযোড়া উজ্জ্বল খর-দৃষ্টির উষ্ণতা আসিয়া লাগিতেছে।

জাহাঙ্গীর এইখানে একটু লাজুক। সে মহিলাদের সঙ্গে অতি মাত্রায় মিশিতে পারে, মিশিতে চায়ও। কিন্তু কোন মেয়ে একটু খর

দৃষ্টিতে চাহিলে সে আর চোখ তুলিতে পারে না। মেয়েদের সে যেমন পছন্দ করে, তেমনি ভয়ও করে। অশ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়।

সে একবার হাজারীবাগের জঙ্গলে শিকারে গিয়াছিল। একদিন রাত্রে সে ফ্ল্যাশ-লাইট দিয়া শিকার খুঁজিতেছিল। হঠাৎ একটা হরিণের চোখে সেই লাইট পড়ায় হরিণ এমন করিয়া সুন্দর ভীতির চাহনি দিয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল, যে, সে আর তাহাকে গুলি করিতে পারে নাই। আজও সে ইচ্ছা করিয়াই পিছন ফিরিয়া ঘাটে বসিয়া সাবান মাখিতে লাগিল। যে হরিণী তাহার দিকে এখনই এমনি করিয়া তাকাইয়াছিল, জাহাঙ্গীর জানে, ইচ্ছা করিলেই তাহাকে হত্যা করিতে পারে, তবু সে বিরত হইল। তাহার কেমন যেন দয়া হয় উহাদের দেখিলে! উহাদের চোখ যাদু জানে। উহাকে এড়াইয়া চলাই ভাল। যাদুকরীকে হত্যা করায় পৌরুষ নাই।

নারী—তাহাকে সে যেমন অশ্রদ্ধা করে তেমনি ভালও বাসে। উহারা সুন্দর যাদুকরী!…জাহাঙ্গীরের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে, দেহের মাংস-পেশীসমূহ প্রস্তর-কঠিন হইয়া উঠে। একবার মনে করে, ঐ সুন্দর চোখের সুন্দর জীবগুলোকে নির্ম্মম হস্তে সে হত্যা করিতে পারে! উহাদের চোখ সুন্দর, উহাদের মন ছলনায় কুটীল!…

জাহাঙ্গীর যখন স্নান সারিয়া উঠিয়া আসিল, তখন চা হইয়া গিয়াছে।

ভূণী ভিতরে চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, সদ্যস্নাত জাহাঙ্গীর তাহার গ্রীক ভাস্করের নিম্মিত মম্মর-মূত্তির মত অনাবৃত দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া।

আদিম মানব প্রথম অরুণোদয় দেখিয়া যেমন বিস্ময়াম্বিত চোখে জবাকুসুমশঙ্কাশ তরুণ অরুণের পানে চাহিয়া দেখিয়াছিল, এ তেমনি দৃষ্টি।

জাহাঙ্গীর তাহাকে অপ্রতিভ হইবার অবসর না দিয়া বলিয়া উঠিল,—দাঁড়াও ভাই ভূণী, পালিয়ে যেয়ো না। চা-টা যখন তৈরীই করলে, তখন না খাইয়ে আর যেয়ো না। কেমন? বলিয়াই মোমির দিকে চাহিয়া বলিল,—তোমার এখনো লজ্জা হবার মত বয়স হয় নি, তুমি কেন অমন জড়-পুঁটুলী হয়ে বসে আছ ভাই?

মোমি সত্যিই এতক্ষণ বিয়ের ক'নেটীর মত কাপড় ঢাকা দিয়া এক কোণে বসিয়াছিল, এইবার খুঁক খুঁক করিয়া হাসিতে লাগিল এবং একটু পরেই ঘোমটা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গীর কাপড় বদলাইয়া চৌকাঠটার উপর বসিয়া ভূণীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, দাও ভাই, চা-টা দাও!

ভূণীকে কে যেন মন্ত্র দিয়া বশ করিয়াছে।

মন্ত্রাহত সাপিণীর মত সে না পারিল পালাইতে, না পারিল ফণা তুলিতে।

সে আস্তে আস্তে এক কাপ চা হারুণকে দিয়া দ্বিতীয় কাপটা কাঁপিতে কাঁপিতে জাহাঙ্গীরের হাতে দিল। আর একটু হইলেই পেয়ালাটা পড়িয়া গিয়াছিল আর কি! জাহাঙ্গীর তাড়াতাড়ি পেয়ালাটা ধরিতে গিয়া ভূণীর কয়েকটা আঙ্গুল ধরিয়া ফেলিল। লজ্জা ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া জাহাঙ্গীর চীৎকার করিয়া উঠিল, বাঃ বাঃ, কি চমৎকার চা-ই হয়েছে ভূণী!

ভূণী ততক্ষণ লজ্জায় ঘামিয়া লাল হইয়া উঠিতেছিল। আর একটু থাকিলেই হয় ত সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহাকে আর থাকিতে হইল না। তাহার অন্ধ পিতা উঠিয়া তাহাকে বাড়ীর ভিতর

হইতে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন। সে তাড়াতাড়ি পালাইয়া বাঁচিল।

হারুণ এতক্ষণ কী যেন ভাবিতেছিল। তাহার আদরের বোনের এই ভাবান্তর সে লক্ষ্য করিয়াছিল। ইহা লইয়া সে আপন মনে কত কি আকাশ-কুসুমের সৃষ্টি করিতেছিল। কত সুখের স্বপন, কত ভবিষ্যতের রাঙা উৎসবের রাঙা দিন, আরো কত কি!

জাহাঙ্গীর চা খাইতে খাইতে বলিল,—ছেলেমানুষ এরা, নাশ্‌তা তৈরী কর্‌তে ত দেরী হবে হারুণ, এস দুটো বিস্কুট নিয়ে খাই। হারুণ আপত্তি করিল না। অন্যমনস্ক ভাবে বিস্কুট ও চা খাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গীর হঠাৎ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, এই মোমি! মোমি! আমার চায়ের কাপটা শেষ হয়ে গেছে। তুমি এসে না দিলে আর এক কাপ চা কিছুতেই খাচ্ছি নে!

মোমি বেড়ার পাশেই উঁকি মারিতেছিল। একটু বাঁকিয়া বাঁকিয়া কাছে আসিয়া চায়ের কাপটা জাহাঙ্গীরের হাতে দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেই জাহাঙ্গীর খপ্‌ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার সঙ্গে চা না খেলে আমি কিচ্ছু খাব না কিন্তু।

হারুণ হাসিয়া বলিল, খা না, এও তোর দাদা-ভাই! জাহাঙ্গীরকে, বলিল, ওকে তুমি চেন না জাহাঙ্গীর, ভয়ানক দুষ্টু। একটু ত এমন জ'মে গেলে তোমায় নাকাল ক'রে ছাড়্‌বে। কোন্ দিন রা ও তোর তোমার কাছায় বেরাল-বাচ্চা বেঁধে দেবে! ওর দুষ্টুমীর জ্বালা পাঁজর-ফাটা সকলে অস্থির!

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, সত্যি? তবে রে দুষ্টু খাইতে খাইতে খাইয়ে ছাড়্‌ছি না তা হ'লে!…

একটু পরেই দেখা গেল, মোমি কলিকাতা সম্বন্ধে তাহার অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা লইয়া প্রশ্ন করিয়া জাহাঙ্গীরকে চা খাইবার অবসর পর্যন্ত দিতেছে না।

জাহাঙ্গীরও অকুতোভয়ে বলিয়া যাইতেছিল,—কল্‌কাতার লোকগুলোর দাড়ি হয় না, সেখানে কাপড় ময়লা হয় না, চুলের তেড়ী ভাঙে না। সেখানে মানুষ পায়ে হাঁটে না, তারা কোমর পর্যন্ত মানুষ, তার পর চারটে চাকা। তাদের চারটে চারটে চোখ। পুরুষের গোঁফ দাড়ি হয় না। মেয়েরা ছেলেদের মত ক'রে চুল কাটে; ছেলেরা মেয়েদের মত চুল বড় রাখে। পুরুষে রান্না করে, মেয়েরা থিয়েটার দেখে, নাচে। ছেলেরা বাঁদর হ'য়ে বাবাকে ভল্লুক ক'রে তার পিঠে চ'ড়ে শ্বশুরবাড়ী যায়, মেয়েরা ডুগ্‌ডুগি বাজায়!

এমন সময় হারুণের ছোট ভাইটি তাহার অন্ধ পিতার হাত ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া আসিল।

জাহাঙ্গীর তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল,—কা'ল আর আপনার সাথে ভালো ক'রে আলাপ করতে পারিনে! আমরা চা খাচ্ছি, একটু দেবো? খাবেন?

হারুণের পিতা খুশী হইয়া বলিলেন,—দাও বাবা, দেখি ভূণী কেমন
ধরিতে। রলে! ভূণী চা করতে পেরেছে ত? আমরা ত কেউ খাইনে।
জন্ম তাড়া এককালে প্রায় তোমার মত চা-খোর ছিলাম বাবা!—বলিয়াই
উঠিল, বাঃ ব, নিঃশ্বাস ফেলিয়া কোন্ সুখময় অতীতকে তাঁহার অন্ধ চক্ষু
ভূণী ততক্ষণ খবার চেষ্টা করিলেন!
থাকিলেই হয় ত মন করুণায় ভিজিয়া উঠিল। মুখের চা বিস্বাদ হইয়া
থাকিতে হইল না।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়াই হারুণের পিতা বলিয়া উঠিলেন, সত্যই ভূণী চমৎকার চা করেছেত রে! ভূণী! ও ভূণী!

ভূণী সলজ্জভাবে দরজার পাশে আসিয়া অধোমুখে আঙুলে আঁচলের প্রান্ত লইয়া জড়াইতে লাগিল।

হারুণ বলিল, ঐ ভূণী এসেছে। কিছু বল্‌ছিলে তাকে?

পিতা হঠাৎ কেমন যেন বিষাদের স্বরে বলিলেন,—না, কিছু না! মোবারক কোথায় গেলি?

মোবারক হারুণের ছোট ভাই। ছেলেটি অদ্ভুত—শান্ত ধীর প্রকৃতির। এই বয়সেই যেন বিশ্বের বিষণ্ণতা আসিয়া তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুখে চোখে আনন্দের এতটুকু ক্ষীণ রেখাটীও নাই। বর্ণ ফ্যাকাসে সাদা, লিক্‌লিকে, পাঁজরের হাড় ক'টি গোণা যায়।

মোবারক চা খাইতেছিল। পিতার ডাকে চকিত হইয়া শান্তস্বরে বলিল, এই যে চা খাচ্ছি!

এরই মাঝে জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, আমরা সকলে চা খাচ্ছি, ভূণী যদি না খাও তা হ'লে......

জাহাঙ্গীর আর কিছু বলিবার আগেই হারুণের পিতা বলিয়া উঠিলেন, —আয় ভূণী, তোর মা ত এখনও ঘুমুচ্চেন, তুইও খা না একটু! এমন সোনার ছেলের কাছে কি লজ্জা কর্‌তে আছে? মনে কর্ না, ও তোর মীনা ভাই!—বলিয়াই পিতা চায়ের কাপ মাটীতে রাখিয়া পাঁজর-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন!

ভূণী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজে হাতে চা করিয়া খাইতে খাইতে বলিল, বাবা তুমি চা খাও, এই আমি খাচ্ছি।

জাহাঙ্গীর দেখিল, ভূণীর দুই আয়ত চক্ষু জলে টইটুম্বুর হইয়া উঠিয়াছে। সে আর এ দৃশ্য সহিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—মোমি এস ত ভাই, আমরা ঐ তোরঙ্গটা খুলি। ওতে কল্‌কাতার বড় বড় বাঁদর আছে, দেখ্‌বে?

মোমি চীৎকার করিয়া বলিল,—ওরে বাপ্‌রে! ও কাম্‌ড়ে দেবে, আমি কিছুতেই খুল্‌তে পারব না!

জাহাঙ্গীর হাসিয়া নিজেই তোরঙ্গটা খুলিয়া একরাশ কাপড় জামা বাহির করিয়া হারুণের পিতাকে বলিল,—আমি এদের জন্য কিছু কাপড় জামা এনেছি—আপনি আদেশ না দিলে ওরা হয়ত নেবে না। ওরা ত আমারও ভাই বোন্!—একটু থামিয়া আবার বলিল,—আমার একটীও ছোট ভাই বোন নেই ব'লে আমার এত দুঃখ হয়! তাই বন্ধুদের ভাই বোন নিয়ে সে সাধ মেটাই!—ভাই মোমি, এ সব নেবে ত? না নিলে কিন্তু আজই চলে যাব আমি!

হারুণ একটু উচ্চ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল,—এ সব আবার করেছ কি? এ সব দামী কাপড় কিন্‌তে তোমার তিন চার শ' টাকার কম পড়েনি যে! এ সব কখন কর্‌লে বল ত! মিষ্টি সন্দেশ ত এনেছ বাগবাজার আর শিউড়ি উজোড় করে!......

জাহাঙ্গীর হাসিয়া একটু নিম্নকণ্ঠে বলিল,—এই ষ্টুপিড্, তুমি চুপ কর! সরকার্‌কা মাল, দরিয়া মে ডাল্! জমিদারীর এত টাকা নিয়ে কি করব? পাপের ধন পরাচিত্তিতে যাক্! আমার ভাই বোন থাক্‌লে খরচ কর্‌তাম না?

হারুণের পিতা অত্যাধিক খুসী হইয়া একটু ভারী কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—এর পরে আর কি বলব বাবা! খোদা তোমাকে সহি-

সালামতে রাখুন, হায়াত দারাজ করুন! তুমি সত্যই আমার ছেলের চেয়ে বড়। যে দানে অহঙ্কার নেই, তাকে কি উপেক্ষা করতে আছে?

ভূণী তাহার জলভরা বড় বড় দুইটি চোখ তুলিয়া জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া থাকিল। সেই দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা করুণা স্নেহ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল!

হারুণের পিতা হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন,—ওরে ভূণী, মোমি, মোবারক! তোরা যা,—নতুন কাপড় পরে দেখা, কেমন মানাল! আর সালাম কর জাহাঙ্গীরকে। নতুন কাপড় প'রে যে সালাম করতে হয়!

মোমি কাপড়ের রাশ লইয়া ভূণীকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল। মোবারক উঠিল না। শান্তভাবে বসিয়া রহিল। কাপড় জামা পাইয়া সে খুশী না বিরক্ত হইয়াছে কিছুই বোঝা গেল না।

জাহাঙ্গীর একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—মোবারক অমন ক'রে ব'সে যে! তোমার বুঝি কাপড় পছন্দ হ'ল না? আচ্ছা দেখ তোমার জন্য কি এনেছি। বলিয়াই একটা ফুটবল বাহির করিয়া বলিল,—এই নাও। আজ বিকেলে সকলে মিলে ফুটবল খেলা যাবে। কেমন?

মোবারক তাহার আনত চক্ষু তুলিয়া বিষণ্ণ মলিন দৃষ্টিতে জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া বলিল,—আমি ত ফুটবল খেলিনে। ও-সময় বাবাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।

জাহাঙ্গীরের মন দুঃখের ম্লানিমায় মলিন হইয়া উঠিল। সে কেমন যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। এত দুঃখের মাঝেও মানুষ বাঁচে কেমন করিয়া!

একটু আলাপ সালাপ হইতেই মোমি তাহার সিল্কের জামা কাপড় পরিয়া আসিয়া জাহাঙ্গীরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, তোমরা সকলে ভিতরে এস, নাশ্‌তা করবে।

ভিতর বাটীতে যাইতে যাইতে হারুণ হাসিয়া বলিল, গ্রীন রংটা তোকে বেড়ে মানিয়েছে ত রে মোমি! দেখেছ, মোমির আর্ট-জ্ঞান হয়েছে! বলিয়াই তাহার মাদ্রাজী ঢংএ কাপড় পরিবার ধরণটার দিকে ইঙ্গিত করিল।

জাহাঙ্গীরও সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিল,—সত্যই ওকে ত সুন্দর মানিয়েছে! কাপড় পরাটাও সুন্দর হয়েছে!

মোমি জাহাঙ্গীরের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, ও আল্লা! এ আমি বুঝি পরেছি? বুবু পরিয়ে দিয়েছে! বুবুকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ্‌বেন চলুন!

জাহাঙ্গীর তাড়া দিয়া বলিল, আবার "আপ্‌নি"? "তুমি" বলবে! আর "দাদাভাই"—কেমন?

মোমি বড় বড় ভ্রু-চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, ও মা! কি হবে! একদিনেই নাকি একটা মিন্‌সেকে তুমি বলা যায়! সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোমি লজ্জা পাইয়া ছুটিয়া পলাইল।

ভিতরে গিয়া বসিতেই শোনা গেল, হারুণের মাতা জাগিয়া উঠিয়া ভূণীর সাজসজ্জা দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—ওরে মা, তুই শ্বশুর বাড়ী চলে গেলে আমি থাক্‌ব কি ক'রে? আমার মীনার মতই যে তোর চোখ মুখ! মা তুই শ্বশুর বাড়ী যাস্‌নে! দামাদ মিঞাকে (জামাই) বল, সে ঘর-জামাই থাক্‌বে!

জাহাঙ্গীর হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। হারুণ তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া ভূণীকে বলিল,—ভূণী, তুই বাইরে চলে আয় না! কিন্তু

আর কিছু বলিবার আগেই ভূণীকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—সত্যি ভূণী, এতে আর দোষ কি! আমিই যে চিন্‌তে পার্‌ছিনে! মনে হচ্ছে বিয়ের ক'নে! কি সুন্দরই মানিয়েছে, দেখ্ দেখ্! বলিয়াই আয়না লইয়া মুখের কাছে ধরিল।

ভূণী মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল,—যাও! তা হ'লে সব খু'লে ফেল্‌ব বল্‌ছি! আমি কিছুতেই বাইরে যেতে পার্‌ব না। মা গো! কেন এ সব পর্‌লুম্!

সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

জাহাঙ্গীর বাহির হইতে বলিল, কী হচ্ছে হারুণ? তুমি ও ত কম দুষ্টু নও!

হারুণ হাসিয়া বলিল,—জাহাঙ্গীর! তোমার পাওনা সালামটা নিতে তুমিই ভিতরে এস ভাই। ও বল্‌ছে এ রকম ক'রে সেজে কিছুতেই বাইরে যাবে না। অর্থাৎ কি না তোমার সামনে বার হ'বে না।

জাহাঙ্গীর হাসিয়া ভিতরে যাইতেই ভূণী একবার তাহার দিকে তাকাইয়াই তাহার মায়ের বিছানায় বসিয়া পড়িয়া বালিশে মুখ লুকাইল। জাহাঙ্গীর কেমন যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

হারুণ ভূণীর মুখ জোর করিয়া তুলিয়া বলিল,—ওরে একবার দেখা ভাল ক'রে! আর, যে-সালামের লোভে জাহাঙ্গীর-বেচারা পা'দুটোকে ভিতর-বাড়ী পর্য্যন্ত টেনে আন্‌লে, তার থেকেই বঞ্চিত কর্‌লি বেচারাকে? ওঠ্, সালাম কর।

কিন্তু উঠাইতে গিয়া হারুণ দেখিল, চোখের জলে ভূণীর মুখ ভাসিয়া গিয়াছে। সেই অশ্রুসিক্ত চোখ না মুছিয়া সে যেমন জাহাঙ্গীরকে সালাম করিতে যাইবে, অমনি এক অভাবনীয় কাণ্ড হইয়া গেল!

ভূণীর উন্মাদিনী মাতা এতক্ষণ উদাস নির্ব্বিকার চক্ষে সমস্ত দেখিতেছিলেন। কিছু বুঝিতেছিলেন বলিয়া বোঝা যাইতেছিল না।

ভূণী যখন জাহাঙ্গীরকে সালাম করিবার জন্য অগ্রসর হইল, তখন তিনি হঠাৎ বিছানা হইতে নামিয়া কন্যার হাত ধরিয়া জাহাঙ্গীরের হাতে দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন,—বাবা! ওপরে আল্লা, নীচে তুমি! আমার তহমিনাকে তোমার হাতেই সঁপে দিলাম। দেখো বাবা! ও যেন কষ্ট না পায়! ওই আমার মীনা! আমার নয়নের মণি!—বলিয়াই ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন!

মাথার ওপর বজ্রপাত হইলেও বুঝি সকলে এমন স্তম্ভিত হইত না! হারুণ, জাহাঙ্গীর, ভূণী ওর্ফে তহমিনা সকলে যেন প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে!

হঠাৎ ভূণীর চোখের দিকে তাকাইয়া জাহাঙ্গীর কাঁপিয়া উঠিল। সে ধরিবার পূর্ব্বেই ভূণী মূর্চ্ছিতা হইয়া তাহার স্কন্ধে এলাইয়া পড়িল!

উঠানের আমগাছটায় বসিয়া একটা পাপিয়া পাখী ডাকিয়া উঠিল, চোখ গেল! চোখ গেল! উহু উহু চোখ গেল!

৯

কাল-বৈশাখীর মেঘ এমনি করিয়াই দেখা দেয়। যেখানে দুঃখের বরষা, বজ্রপাতও হয় সেইখানেই। শান্ত নদীতীরে তারো চেয়ে শান্ত ভগ্ন কুটীর এমনি করিয়াই কোন্ এক দুর্য্যোগের নিশীথে ভাসিয়া যায়!

দুঃখ যে কত বড় বন্ধুর রূপ ধরিয়া আসে, হারুণ তাহাই ভাবিতেছিল—একাকী দাওয়ায় বসিয়া।

অন্ধ পিতা একমনে কলিকার পর কলিকা তামাক পোড়াইতেছিলেন। অগ্নি-গিরির গর্ভ হইতে যে ধূম্রপুঞ্জ নির্গত হয়, তাহার জ্বালাও বুঝি এত ভয়াবহ নয়! ঘর পোড়ে, সকলে দেখে, পোড়ারও অবধি আছে; কিন্তু মনে যদি একবার আগুন লাগে—তাহা কেহ দেখেও না, তাহার অন্তও নাই!

মোমি তাহার সিল্কের সাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া আবার সেই ছিন্ন মলিন সাড়িটা পরিয়া গৃহকর্ম্মে রত হইয়াছে। ঐটুকু মেয়ে, তাহার এই দুঃখ ঢাকিবার কঠোর প্রয়াস দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা দায় হইয়া উঠে! এ যে কত বড় দুঃখ, কোথা দিয়া কি হইল, সে হয় ত ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে নাই। তাহার চারিপাশে সে যেন কাহাদের দীর্ঘশ্বাস, কাহাদের নিঃশব্দ ক্রন্দন অনুভব করিতেছে। কিসের এ দীর্ঘঃশ্বাস, কিসের এ বিষাদ, সে তাহা জানেনা! তাহাকে সব চেয়ে বেশী বেদনা দিয়াছে—জাহাঙ্গীরের আজই কলিকাতা চলিয়া যাওয়ার আয়োজন।

উন্মাদিনী মাতা অঘোরে ঘুমাইতেছেন—উন্মাদিনী নিয়তির মতই নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত আরামে !

ভূণী তাহার সকালের-পরা সাজসজ্জা লইয়া পাষাণ-প্রতিমার মত বসিয়া আছে। হারুণ একবার চুপি চুপি তাহাকে ও অলক্ষুণে বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে বলায় সে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, ওঁকে যেতে দাও ভাই, তারপর চিরকালের জন্যই খু'লে ফেল্‌ব ! ইহার পর হারুণ আর কিছু বলিতে সাহস করে নাই।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জাহাঙ্গীর সমস্ত বাধিয়া ছাদিয়া সহজ শান্ত ভাবে হারুণদের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। হারুণ তাহাকে কিছু বলিবার আগেই ভূণী ভিতর হইতে ডাকিল, মেজ ভাই, শুনে যাও।

হারুণ জাহাঙ্গীর দুইজনারই বুক কাঁপিয়া উঠিল।

ভূণী তাহার সেই বধূ-বেশ লইয়া অকুতোভয়ে বাহিরে আসিয়া বলিল, বা'জান ! তুমি দলিজে যাও ত একটু !

ইহা যেন অনুরোধ নয়, এ আদেশ।

মনে হইল, অন্ধ পিতা সব বুঝিয়াছেন। মোবারককে ডাকিয়া গভীর দীর্ঘঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

জাহাঙ্গীরের ভয় করিতে লাগিল, বুঝি মাতার মত কন্যারও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। সে আঙিনায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। নিজের জন্য নয়, এই হতভাগিনীর দুঃখে ! তাহার জীবন-দেবতা তাহার জীবন লইয়া কি খেলা খেলেন, তাহা দেখিবার জন্য সে নিজেকে অম্লান বদনে তাঁহার হাতেই সঁপিয়া দিয়াছে। আজিকার বজ্রপাতকেও সে তাই মাথা পাতিয়াই গ্রহণ করিবে !

ভূণী একটু জোরে জোরেই হারুণকে বলিল, মেজ-ভাই, আমি তোমার বন্ধুর সাথে দুটো কথা বল্‌তে পারি ?

হারুণ অবাক হইয়া ভূণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ভূণী তেমনি সতেজ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, বুঝেছি মেজভাই, তুমি কি ভাব্‌ছ। কিন্তু ভাব্‌বার কিছু নেই এতে। আমার মঙ্গল অমঙ্গলের কথা আমার চেয়ে কেউ বুঝ্‌বেনা। আমি তোমারি ত ছোট বোন্‌। আমায় দিয়ে অন্যায় কিছু হবেনা, এ তুমি জেনে রেখো। আমি আমার দুর্ভাগ্যের শেষটুকু জেনে নিতে চাই।

হারুণের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার মাতার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

ভূণী জাহাঙ্গীরের দিকে চাহিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে, একটু ভিতরে এসে বস্‌বেন ?

জাহাঙ্গীর কলের পুতুলের মত সে আদেশ পালন করিল।

ভূণী একেবারে জাহাঙ্গীরের পায়ের নীচে বসিয়া পড়িয়া অশ্রু-টলমল ডাগর চক্ষু দুটী ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, আপনি কি এখনি চ'লে যাচ্ছেন ?

জাহাঙ্গীর তাহার পা চৌকিতে তুলিয়া ত লইলই না, কোন প্রকার অশোয়াস্তির ভাবও তাহার ব্যবহারে ফুটিয়া উঠিল না। সহজ শান্ত কণ্ঠেই সে বলিয়া উঠিল, হাঁ ভাই আমি যাচ্ছি !...একটু থামিয়া বলিল, দুঃখের পসরা খোদা আমার মাথায় তুলে দিয়েছেন, তার জন্য দুঃখ করিনে ভাই, কিন্তু এর তাত্‌ যে অন্যের গায়ে গিয়ে লাগে, এ দুঃখ রাখ্‌বার আর ঠাঁই নাই ! আমি এসেছিলাম দুঃখ ভুল্‌তে, কিন্তু সে

দুঃখ যে এত বিপুল হয়ে উঠ্‌বে, সে দুঃখ যে অন্যেরও ঘর পোড়াবে— এ আমি জন্‌তাম না!

ভূণী একটু হাসিয়া সাড়ির আঁচলটায় পাক দিতে দিতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, সত্যই কি তাই? আপ্‌নাদের বড় লোকের কি কোনোরকম দুঃখ-বোধ আছে?

জাহাঙ্গীর আহত হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কথা কেন বল্‌ছ ভাই? আমরা তোমার কথায় "বড়লোক" হ'লেও মানুষ। অন্ততঃ আমার হৃদয় নাই—এমন কিছুরই হয়ত পরিচয় দিইনি এখনো।

ভূণী তেমনি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, দেন নাই, পরে দেবেন! আচ্ছা, আপনি ত মহৎ, হৃদয়বান, এবং সেই জন্যই হয়ত তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছেন! আপনি স্বেচ্ছায় এসেছেন, স্বেচ্ছায় যাবেন, এতে কারই বা বল্‌বার কি আছে! কিন্তু আমার কি হবে, বল্‌তে পারেন?— আবার সে তাহার দুই আয়ত লোচনের অশ্রুর আবেদন জাহাঙ্গীরের পানে তুলিয়া ধরিল!

জাহাঙ্গীর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি বুঝেছি ভূণী, আজ কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! কিন্তু তুমিও কি এতবড় মিথ্যা-টাকেই সত্য বলে গ্রহণ করলে? পালিয়ে আমি যাচ্ছিনা, আমি যাচ্ছি এই লজ্জার হাত এড়াতে। হারুণ আমার কত বড় বন্ধু, তা হয়ত তুমি জাননা। আমার হাত দিয়েই তোমাদের এতবড় লাঞ্ছনা ছিল, তা আমি জান্‌তাম না। কিন্তু তুমি ত জান, এতে আমাদের কারুরই অপরাধ নাই। অপরাধ শুধু আমার দুরদৃষ্টের!

ভূণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দুরদৃষ্ট শুধু আপনার নয়, আমার। যে আগুন লাগায়, সে জানেনা যার বুকে আগুন লাগ্‌ল—তার কত-

টুকু পুড়্ল! সে যাক, আপনি যেটাকে মিথ্যা বল্‌ছিলেন, আপনি বোধ হয় জানেন না, সেটার চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে নেই! আপনি বল্‌বেন, মা আমার উন্মাদিনী। তবু তিনি আমার মা। আমরা নারী, আমরা হয়ত সকল-কিছু অন্ধের মত বিশ্বাস করি। খোদার ইঙ্গিত না থাক্‌লে এ অভাবনীয় দুর্ঘটনা আমার উন্মাদিনী মায়ের হাত দিয়ে ঘট্‌তনা। তাহার পর একটু থামিয়া সে শান্ত কণ্ঠে বলিল,—আমি খুলেই বলি আপনাকে, মা যার হাতে আমায় সঁপে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে নাই!

জাহাঙ্গীরের মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীর চন্দ্র সূর্য্য সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে। একাকী অন্ধকারে সে অতল হইতে অতলতর গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছে।

কিন্তু সে মূহূর্ত্তকালের জন্য। একটু পরেই সে সাম্‌লাইয়া উঠিল। সে আর কিছু বলিতে যাইবার পূর্ব্বেই ভূণী ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, আপনি যা বল্‌বেন তা আমি জানি। ফাঁসির আসামী যেমন ক'রে তার দণ্ডাজ্ঞা শোনে, আপ্‌নার কাছ থেকে হয় ত তেম্‌নি করেই তেম্‌নি কঠোর কিছুই শুন্‌তে হবে; আমি তার জন্য প্রস্তুতও আছি। তবু আমি আমার যা বল্‌বার—বল্‌লাম। আপনি আমায় পাগল বা ঐ রকম অদ্ভুৎ-কোনো-কিছু ভাব্‌ছেন, না?—আবার সেই অস্তমান শশীকলার মত কান্নাভরা হাসি!

জাহাঙ্গীর এতক্ষণে তাহার পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া ভূণীর দিকে তাকাইয়া দেখিল। তাহার চক্‌চকে চোখ নিমিষে ব্যথা-ম্লান হইয়া উঠিল। ঐ নিমিষের দৃষ্টি বিনিময়। তাহার মনে হইল, ঐ অপূর্ব্ব সুন্দর দুইটী

চক্ষুর জন্যই সে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে!… হঠাৎ তাহার সুপ্ত আহত অভিমান যেন নিদ্রোত্থিত কেশরীর ন্যায় জাগিয়া উঠিল। বন-হরিণীর মত চক্ষু ইহাদের, হরিণীর মতই মায়াবী ইহারা, তবু ইহারা শিকারের জীব! ইহাদের হত্যা করার পৌরুষও নাই, করিলে লজ্জাও নাই! তাহার মনে হইতে লাগিল, সে জাহাঙ্গীর নয়—সে শুধু মদ্যপ চরিত্র-হীন ফররোখ সাহেবের পুত্র!

এইবার সে একটু বক্র হাসি হাসিয়াই বলিল, তোমার মা উন্মাদিনী হ'লেও তোমায় তা ভাব্‌তে পারিনা ভূণী। আর কোনো মেয়ে হ'লে তাকে ধূর্ত্ত বল্‌তাম—প্রগল্‌ভা না ব'লে; কিন্তু তোমায় তা বলতে আমার মত কশাইএরও বাধ্‌বে! আমার কপালই এই রকম। যা'রাই আমার জীবনে বিপর্য্যয় এনেছে, তা'দের সকলেই অদ্ভুত এক-একটা জীব। কিন্তু সে কথা যাক। তুমি এখনি বল্‌ছিলে—ফাঁসির আসামীর মতই আমার দণ্ডাজ্ঞা শুনতে প্রস্তুত আছ। আমি যদি সত্যিসত্যিই তোমার যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা দিই, তুমি তা সইতে পার্‌বে? বলিয়াই নিষ্ঠুরের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভূণী মুহূর্ত্তের জন্য অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার পরেই সে গলবস্ত্র হইয়া জাহাঙ্গীরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, তোমার ঐ দণ্ডাজ্ঞাই গ্রহণ কর্‌লাম! তাহার পর ভিতরে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, অনেক অদ্ভুত জীবই ত দেখেছেন জীবনে, এবং সে জীব-হত্যায় আপনার হাত যশও আছে মনে হচ্ছে, এইবার আরেকটা জীব দে'খে গেলেন! কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, যা'দের জীব-হত্যাই পেষা, তাদের সে ঋণ একদিন শোধ করতে হয় ঐ বন্য-জীবের হাতেই!—বলিয়াই সে রাণীর মত সগর্ব্বে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গীর একটু চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল, আমার শেষ কথা শু'নে যাও তহমিনা, নৈলে আমায় নিয়ে সব চে'য়ে বড় দুঃখ পোহাতে হবে তোমার!

ভূণী ভিতর হইতে বলিল, আমি এখান থেকেই আপনার চীৎকার শুন্‌তে পাচ্ছি, বলুন।

জাহাঙ্গীর সহসা এই ব্যঙ্গোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার অপূর্ব্ব আত্মসংযমের বলে কণ্ঠ যথাসম্ভব শান্ত করিয়া বলিল,—আমি প্রেমও বিশ্বাস করিনে, পৃথিবীর কোনো নারীকেও বিশ্বাস করিনে! মনে হচ্ছে, তোমার সব কথাই আর-কারুর শেখানো, অথবা ওগুলো অতিরিক্ত নভেল পড়ার বদ্‌হজম! তোমাদের জা'তটারই নির্ব্বাসন হওয়া উচিত। একেবারে কালাপানি!

ভূণী রেকাবিতে করিয়া এক রেকাবী সন্দেশ ও এক গ্লাস পানি লইয়া জাহাঙ্গীরের সাম্‌নে রাখিতে রাখিতে সহজ কণ্ঠেই বলিল, আপনি বড্ডো দুর্ম্মুখ! যাবেনই ত, যাবার সময় একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যান। বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, মাফ কর্‌বেন, আপনার দেওয়া মিষ্টি দিয়েই আপনার তেঁতো মুখ মিষ্টি কর্‌তে হচ্ছে! জানেনই ত, আমরা কত গরীব! তাতে আবার পাড়াগেঁয়ে। একটা ঘরের মিষ্টি দিয়েও আপনার জমীদারী মুখের ঝাল মিটাতে পার্‌লামনা! আপনি খান, আমি দুটো পান সেজে আনি। বলিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গীর আর একটা কথাও না বলিয়া সুবোধ বালকের মত রেকাবীর মিষ্টি গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। তাহার আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল, মিষ্টি যে এত মিষ্টি হয়—তাহা সে জীবনে উপলব্ধি

করে নাই, হয়ত আর কখনো করিবেও না। কিন্তু এই নারী, এই প্রগল্‌ভা তরুণী! এ কোথা হইতে আসিল? বনফুলের এই সৌন্দর্য্য, এত সুবাস! গহন-বনের অন্ধকারে এ কোন্ কস্তুরী মৃগ তাহার মেশ্‌ক্-খোশ্‌বুতে সারা বন আমোদিত করিয়া তুলিতেছে? কয়লার খনিতে এ কোন্ কোহিনূর লুকাইয়া ছিল? জাহাঙ্গীর যেন দিশা হারাইল। সে জহাঙ্গীর নয়, বিলাসী ফর্‌রোখ সাহেবের পুত্র নয়, সে "শিভাল্‌রি" যুগের বীর নায়ক, বিংশ শতাব্দীর সভ্য যুবক! সে এই মহীয়সী নারীর অবমাননা করিবে না! আপনার অজ্ঞাতেই তাহার কণ্ঠ দিয়া উচ্চারিত হইল, তহ্‌মিনা! তহ্‌মিনা!

ভূণী তশ্‌তরীতে পান লইয়া আসিতেছিল। জাহাঙ্গীরের এই অস্বাভাবিক স্বরে একটু বিস্ময়ান্বিত হইয়াই সে নিকটে আসিয়া বলিল, আমায় ডাক্‌ছিলেন?

জাহাঙ্গীর অপ্রতিভ হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, না! জাহাঙ্গীর নিজেই চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার নিজের কণ্ঠস্বরে যে এত মধু আছে তাহা সে নিজেও জানিত না।

ভূণী স্নেহ-গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এই ত বেশ লক্ষ্মীছেলের মত সব মিষ্টিই খেয়েছেন দেখ্‌ছি। দেখুন, আপনি বড্ডো বদ্‌রাগী; হয়ত আপনার কোনো অসুখ-বিসুখ আছে, দোহাই! কল্‌কাতা গিয়ে একটু চিকিৎসা করাবেন! বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তাইত বলি, যে লোক দু'হাতে এত হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি বিলাতে পারে, তার মেজাজ কি এত তেঁতো হয়? আর দুটো মিষ্টি এনে দেই, লক্ষ্মীটী, না বল্‌বেন না! সেই কখন্ দুপুর রাত্তিরে কল্‌কাতা পোঁছাবেন, আর ক্ষিদের চোটে রাস্তায় হয়ত কাউকে খুন ক'রেই বস্‌বেন! যা মেজাজ, বাপ্‌রে! বলিয়াই জাহাঙ্গী-

রের দিকে গভীর সানুরাগ দৃষ্টি দিয়া তাকাইতেই দেখিল, জাহাঙ্গীর মুখে ক্রমাগত পান ঠাসিতেছে।

ভূণী এইবার ছেলেমানুষের মত তরল কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, অ মা! কি হবে! পান খেয়ে ফেলেছেন? ফেলে দিন, ফেলে দিন! বেশ! ফেল্‌বেন্ না ত! বলিয়াই বহুদিনের রোগ-ক্লান্ত রুগীর মত শ্রান্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, চির-নির্ব্বাসনই ত দিয়ে গেলেন। আপনাকে যতটুকু জেনেছি, তাতে এ আমার ধ্রুব ধারণা, যে, আর আমাদের কোনো কালেই দেখা হবেনা! তাহার পরে একটু থামিয়া চোখ মুখ ডাঁশা আপেলের মত লাল করিয়া সলজ্জ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমাদের যদি আজ সত্যিসত্যিই বিয়ে হয়ে যেত, তা হ'লে এক বছরেও হয়ত এত কথা এমন ক'রে বল্‌তে পার্‌তাম না তোমার কাছে। দুর্দ্দিনে মানুষকে এমনি বেহায়া ক'রে তোলে! ·…আমার যে এক মুহূর্ত্তেই জীবনের সাধ মিটিয়ে ফেল্‌তে হবে! আমার মত দুর্ভাগিনী এক কার্‌বালার সকিনা ছাড়া বুঝি কেউ নেই! বলিয়াই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভিতরে চলিয়া গেল!

জাহাঙ্গীরের কেবলি মনে হইতে লাগিল, সে বুঝি ইহজগতে নাই। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার সমস্ত অঙ্গ যেন কাহার অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া যাইতেছে! সে না পারিল নড়িতে, না পারিল একটা বাক্য উচ্চারণ করিতে! কিন্তু তাহার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না যখন সে দেখিল, অল্প পরেই ভূণী আর এক রেকাবী সন্দেশ লইয়া তাহার সম্মুখে রাখিতেছে। তাহার মনে হইল, কে যেন যাদু করিয়া তাহাকে এই রহস্য-পুরীতে বন্দী করিতেছে! সে যেন সকল দেশের সকল গল্প কাহিনীর নায়ক—রূপ-কুমার। হঠাৎ সে অভিভূতের মত বলিয়া

ফেলিল, তহমিনা! তুমি আমার সাথে যাবে? জানিনা, তুমি কারবালার সকিনা, না, সিস্তানের তহমিনা। বল, তুমি যাবে?

ভূণী দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, না!

জাহাঙ্গীরের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। সে আবার বহুক্ষণ ধরিয়া ভূণীকে দেখিল। দেখিয়া দেখিয়া যেন সাধ মিটিতে চায়না হায় রে ভূখারী অবিশ্বাসী চোখ! তবু সে জিজ্ঞাসা করিল, কেন যাবেনা? তুমিই না বল্‌ছিলে, তোমার মা যার হাতে তোমায় স'পে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড় সত্য তোমার আর নেই।

ভূণী মৃদু কণ্ঠে বলিল, এখনো তাই বল্‌ছি। তবু এমন ক'রে ত যাওয়া যায় না। আপনাকে আমি উপদেশ দিতে পারি, এত বড় স্পর্দ্ধা আমার নেই। আমার অন্তরের সত্য যত গভীরই হউক, তবু তাকে সমাজের কাছে রং বদ্‌লিয়ে নিতে হবে। নৈলে কেউই সুখী হ'তে পারবনা।

জাহাঙ্গীর অনেক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তাহার পর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, তা হ'তে পারেনা ভূণী, আমি এতক্ষণ ভুল বক্‌ছিলাম। আমায় ক্ষমা কর। যে প্রেমে অবিশ্বাস করে, তার মত হতভাগ্য বুঝি বিশ্বে কেউ নেই। তার কোথাও কোনো কিছুতেই সুখ নেই। আমায় নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পারবেনা, আমিও তোমায় নিয়ে—শুধু তোমায় ব'লে নয়—কোনো নারীকে নিয়েই সুখী হ'তে পার্‌বনা। যে সত্যকে আমি চোখের সাম্‌নে দেখি, তাকেও বিশ্বাস কর্‌তে পারিনে, আমার রক্তে রক্তে যেন প্রতিধ্বনি ওঠে, ভুল, ভুল, এ সব মিথ্যা, ছলনা! আমি তোমায় আমারো অজানিতে দুঃখ দিয়ে গেলাম, কিন্তু তুমি ত জান—আমার অপরাধ কতটুকু। তোমার কোনোদিন কোনো

উপকার ক'রেও যদি আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের লাঘব করতে পারি, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব—শুধু এইটুকুই মনে রেখো আমার। আর সব ভু'লে যেয়ো। শেষের কথা কয়টী বলিবার সময় তাহার কণ্ঠ যেন ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল!—সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, তবে যাই এখন!

ভূণী ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, অনুগ্রহ ক'রে আপনার এই কাপড় কয়খানা নিয়ে যান! একটু বসুন, আমি আস্ছি'!

জাহাঙ্গীর চলিয়া যাইতেছিল! ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি ত তোমায় নির্ব্বাসনই দিলাম, ঐ সাড়ী তোমার জেলের পোষাক!

তহ্‌মিনা সেইখানেই ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর মত লুটাইয়া পড়িয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আমি পারবনা পারবনা এ শাস্তি বইতে! নিষ্ঠুর, আমায় তুমি প্রাণদণ্ড দিয়ে যাও, এ নির্ব্বাসন দিয়োনা, দিয়োনা!

দুটো পাপিয়ায় তখনো আঙিনায় যেন আড়াআড়ি করিয়া ডাকিতেছিল, পিউ কাহাঁ পিউ কাহাঁ! চোখ গেল, চোখ গেল!

১০

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জাহাঙ্গীর গরুর গাড়ীতে চড়িয়া শিউড়ি চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার বিষণ্ণতা এমন করিয়া বুঝি আর কখনো নামে নাই হারুণদের বাড়ীতে।

ভূণীর যখন জ্ঞান হইল, তখন তাহার সর্ব্বপ্রথম এই প্রার্থনাই অন্তর ভরিয়া গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল, ধরণী দ্বিধা হও! এ মুখ যেন আর দেখাইতে না হয়!

সেও কি সত্যসত্যই তাহার মাতার ন্যায় উন্মাদিনী হইল? নহিলে এত কথা এমন লজ্জাহীনার মত সে বলিল কেমন করিয়া?...সন্ধ্যার এ অন্ধকার যেন আর না কাটে! সে আর আলোকের মুখ দেখিতে পারিবে না।

কেহ সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিলও না। কেহ জ্বালিতেও বলিল না। আলো জ্বলিয়া উঠিলে বুঝি এ বেদনা এ লজ্জার কালিমা দ্বিগুণতর হইয়া দেখা দিবে।

বাড়ীর প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের কাছে অপরাধী!

উন্মাদিনী মাতার আবোলতাবোল বকুনীর মাঝে ক্রন্দনও শোনা যাইতেছিল, মানা আমার! বাপ আমার! এসে আবার চ'লে গেলি?

হারুণ এতক্ষণ একটি পুকুরের নির্জ্জন পাড়ে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছিল। জাহাঙ্গীরের ত কোনো অপরাধই নাই। কিন্তু

নাই বা বলি কেমন করিয়া? সে কেন এ দরিদ্রের বাড়ী আসিতে চাহিল? যদি আসিলই এবং দৈবক্রমে এ দুর্ঘটনা ঘটিলই যদি, সে ইহার মীমাংসা করিয়া গেল না? হ'তে পারে, তাহারা দরিদ্র, কিন্তু বংশ গৌরবে তাহারা ত একটুও খাটো নয়। আর ঐ ভূণী, অমন অপরূপ সুন্দরী অপূর্ব্ব বুদ্ধিমতী মেয়েও কি তাহার বধূ হইবার অযোগ্যা? তাহাকে যে অবহেলা করিয়া গেল, এই বেহেশ্‌তী ফুলের মালাকে যে পদ-দলিত করিয়া গেল, সে কি মানুষ? ভালই হইয়াছে, ঐ হৃদয়হীন বাঁদরের গলায় এ মুক্তার মালা শোভা পাইত না বলিয়াই এ অঘটন ঘটিয়া গেল!...কিন্তু ভূণী! উহার কি হইবে? জাহাঙ্গীরের সাথে তাহার সমস্ত কথাই সে শুনিয়াছে ভূণীকে সে ভাল করিয়াই চিনে। সে ভাঙ্গিবে কিন্তু নোয়াইবেনা! সে ভয় করিতে লাগিল, এইবার তাহার অন্ধ পিতা আর বাঁচিবেন না!

হঠাৎ তাহার মনে হইল জাহাঙ্গীরের বিদায়-ক্ষণের কথা। সে হারুণকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়াছিল, আমার সব কথা শুনলে তুমিই আমায় বোন্ দিতে রাজী হবে না হারুণ! হারুণ পীড়াপীড়ি করাতে সে বলিয়া-ছিল, সব কথা আমার বল্‌তে চাইনে ভাই। হয়ত বা আমার সব কথা আমি নিজেই জানিনে। কিন্তু আমার যেটুকু কৃতকর্ম্মের জন্য আমি দায়ী, অন্ততঃ সেইটুকু শুন্‌লেই তোমার রক্ত হিম হয়ে যাবে!...আমি খুলেই বলি, আমি বিপ্লবী!

চলিতে চলিতে হঠাৎ গোখ্‌রো সাপের গায়ে পা পড়িলে—মানুষ যেমন চম্‌কাইয়া ওঠে, হারুণ তেমনি চমকিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল,—জাহাঙ্গীর, তুমি—তুমি—বিপ্লবী?

অবশ্য, বিপ্লবী—রিভোলিউশনারী যে কোন্ ভয়ানক জীবকে

বোঝায় তাহা সে স্পষ্ট করিয়া জানিত না। আর স্পষ্ট করিয়া জানিত না বলিয়াই তাহার অত ভয়! ভূত দেখা যায় না বলিয়াই না লোকের এত ভূতের ভয়? হারুণ ছেলেবেলা হইতেই একটুকু অতিরিক্ত ভীরু। আজো সে রাত্রে একা ওঠা ত দূরের কথা—একা ঘরে শুইতেই ভয় করে। কাজেই চোখের সাম্‌নে একজন বিপ্লবীকে দেখিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, সে সত্য সত্যই ভূত দেখিতেছে! সে জানিত বিপ্লবী-দেরে তাহারা ত দূরের কথা, সি-আই-ডি পুলিসেও দেখিতে পায় না! উহারা আকাশ-লোকে অভিশাপের মতই ধরাছোঁওয়ার বহু ঊর্দ্ধে থাকিয়া বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং হঠাৎ বজ্রপাতের মতই কখন্ শিরে আসিয়া পতিত হয়।

সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, কিন্তু বিপ্লবীরা যে ভীষণ লোক জাহাঙ্গীর! তুমি ত তা নও!

জাহাঙ্গীর হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল, ভয় নেই হারুণ, বিপ্লবীরা তোমার আমার মতই ঘরের মানুষ, বনের বাঘ নয়! আর যদি আমা-দেরে সত্যিই তা মনে কর, তা হ'লে ত তোমারই এ বিয়েতে সর্ব্বপ্রথম অসম্মত হওয়া উচিত। কিন্তু আসল কথা কি জান হারুণ, আমি বিয়ে কর্‌তে পারি না, আমাদের বিয়ে কর্‌তে নেই!

হারুণ শুধু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে তাকা-ইয়া রহিল!

জাহাঙ্গীর হঠাৎ একটু কর্কশকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, তুমি এত বেশী ভীরু তা আমি জান্‌তাম না হারুণ। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তোমায় আমার এ পরিচয় দিয়ে ভাল করিনি। আমরা সত্যিসত্যিই বাঘের চেয়েও ভীষণ—কিন্তু শুধু তারি জন্য যে বিশ্বাসঘাতকতা করে!

আমি যে কথা তোমায় বল্‌লাম, তা যদি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায়, তা হ'লে, বন্ধু——বলিয়াই সে বুকের তলা হইতে যে অস্ত্র বাহির করিয়া দেখাইল, তাহাতে হারুণ পতনোন্মুখ বংশ পত্রের মত কাঁপিতে লাগিল !

জাহাঙ্গীর পরক্ষণেই হাসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আশা করি—কোনোদিনই এর প্রয়োজন হবে না বন্ধু। অনেক দুঃখ দিয়ে গেলাম, তবে এর এককণা ঋণও যদি পরিশোধ কর্‌তে পারি কোনোদিন, তা হ'লে আমার মনের অনুশোচনা অনেক কমে যাবে !... আর দেখ, তুমি একটু চেষ্টা কর্‌লেই ভূণী সব ভুলে যাবে। হাজার হোক, ছেলেমানুষ বৈ ত নয় ! তা ছাড়া মা উন্মাদিনী হ'লে ছেলে মেয়ে একটু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হয়। তবে, এ মাটির পৃথিবীতে ও-সব টিকেনা ভাই, এই যা ভরসার কথা !

শেষের দিককার কথা কয়টার নিষ্ঠুরতা ও বিরসতা হারুণকে গভীরভাবে বাজিলেও সে শুষ্ককণ্ঠে কোনোরকমে বলিয়াছিল, তা হ'লে এস ভাই ! আশা করি, এর পরেও আমরা বন্ধু থাক্‌ব ! জাহাঙ্গীর "নিশ্চয়ই" বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

হারুণ কেবলি ভাবিতে লাগিল, একটা লোকই একসঙ্গে এত ভাল এবং এত মন্দ কি ক'রে হ'তে পারে !

এমন সময় অন্ধ পিতার ডাক শুনিয়া হারুণের দুঃস্বপ্ন টুটিয়া গেল। ভিতরে ঢুকিয়া সে একটু উচ্চকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, আজ কি বাতি জ্বল্‌বে না বাড়ীতে ?

ভূণী উঠিয়া আলো জ্বালিতে চলিয়া গেল।

হারুণ দাওয়ায় উববিষ্ট তাহার পিতার নিকট বসিয়া পড়িল, আমায় ডাকছিলে আব্বা ?

অন্ধ পিতা ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন, হুঁ! তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, এখন কি করা যায়—ঠিক করলে কিছু?

হারুণ নম্রস্বরে বলিল, এর কি আর ঠিক করবার আছে?

তাহার পিতা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিছু করবার নাই? বেশ! তোমার কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। আমি পিতা হয়ে চোখের সামনে মেয়ের সর্ব্বনাশ দেখতে পারব না! আমি কালই জাহাঙ্গীরের মাকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিব। দেখি, উনি কি বলেন. তারপর আমার যা করবার করব।

হারুণ মিনতি-ভরাকণ্ঠে বলিল. না আব্বা. তা তুমি করতে পারবে না। ওতে আমাদের মান ইজ্জতের হানি ছাড়া লাভ কিছু হবে না!

অন্ধ পিতা বহুক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, তুমি ঠিকই বলেছ বাবা, কিন্তু এ ছাড়া ত উপায়ও দেখছি না। তুই ত জানিস হারুণ ভূণী কেমন ধাতের মেয়ে। ওকে কি কেউ বিয়ে দিতে পারবি মনে করিস্? তোর কাছে যা শুনেছি, তাতে মনে হয়, জাহাঙ্গীরের মা'র সত্যিকার বুদ্ধি শুদ্ধি আছে হৃদয়ও আছে। আমার এই দুঃখের কাহিনী শুনলে তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে এর একটা সমাধান করবেনই।

হারুণ বলিল, তুমি জাহাঙ্গীরকে চেনো না আব্বা, ওর মা কেন ওর বিধাতা এসেও ওকে টলাতে পারবেন না! তুমি ও-চেষ্টা ক'রোনা।

পিতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তুই থাম্ হারুণ! তুই আমার চেয়ে বেশী বুঝিস্ না।

ভূণীর কপাল যদি পুড়েই থাকে, তা হ'লে ভাল করেই পুড়ুক! আমিও আমার দুঃখের শেষ সীমা দেখে নিই! তারপর উপরে খোদা আছেন, আর পায়ের নীচে ত গোর আছেই!

১১

জাহাঙ্গীরের জীবনে এই প্রথম গরুর গাড়ীর অভিজ্ঞতা।

জাহাঙ্গীর যখন বলিল, সে কিছুতেই তাহার বোঝা আর একজন মানুষের—অর্থাৎ কুলির মাথায় চড়াইয়া দিয়া তাহার অবমাননা করিবে না, বরং সে তাহার এই আভিজাত্যের অভিশাপ নিজেরই মাথায় তুলিয়া বহিয়া লইয়া যাইবে, তখন হারুণ একরকম জোর করিয়াই তাহার জন্য গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিল।

গরুর গাড়ীতে চড়িতে জাহাঙ্গীরের শহুরে সংস্কারে একটু বাধিলেও সে আর আপত্তি করিল না। একটু কৌতূহলও যে হইল না, এমন নয়।

হারুণ হাসিয়া বলিয়াছিল, আশা করি গো-জাতির প্রতি তোমার মানবত্ব-বোধ আজও প্রবল হয়ে ওঠেনি!

জাহাঙ্গীরও হাসিয়া বলিয়াছিল, না বন্ধু! বাঙালীর বুদ্ধি আজো সে রকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। ওরা হনুমান ও গরুর পূজা করেনি কখনো! ঐ দুটী জীব বাঙলার বাইরেরই দেবতা হয়ে আছেন! .....

গরুর গাড়ীতে চড়িয়া ক্রোশ খানিক যাইবার পর জাহাঙ্গীরের কৌতূহল ও উৎসাহ একেবারে জল হইয়া গেল! অসমান গ্রাম্যপথে ঘণ্টায় প্রায় এক মাইল গতিতে সনাতন গো-যান যে বিচিত্র শব্দ করিয়া ধুলি-পটল উড়াইয়া চলিতেছিল, তাহাতে জাহাঙ্গীরের ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকা একপ্রকার অসহ্য হইয়া উঠিল। অনবরত ঝাঁকুনি খাইতে খাইতে

তাহার মনে পড়িল বহুপূর্ব্বে তাহার একবার ডেঙ্গু জ্বর হইয়াছিল, তাহাতে যে গা হাত পায়ের ব্যথা হইয়াছিল, সে বোধ হয় ইহার কাছে কিছুই নয়। সে আর থাকিতে না পারিয়া নামিয়া পড়াতে বেচারা গাড়োয়ান বিনয়-নম্র-স্বরে বলিয়া উঠিল,—জি, নাম্‌লেন কেনে?

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, তোমার 'জি' সাধ ক'রে নাম্‌লেন না বাপু, তোমার গাড়ী তাকে নামিয়ে তবে ছাড়্‌লে!

গাড়োয়ান গাড়ী থামাইয়া বলিল,—জি, গাড়ীতে উঠে বসুন, আমি একটুকু চাঁওড় ক'রে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এই শালার গরু হুজুর একটু বেয়াড়া, তাইতে ভয় করে—কোথায় গোবোদে ফেঁলিয়ে দিবে! নইলে দাঁদা'ড়ে নিয়ে যেতুম।

জাহাঙ্গীর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি 'দাঁদাড়ে' নিয়ে চল বাপু, আমি খানিকটা হেঁটে যাই। বলিয়াই গাড়ীর পিছনে পিছনে আস্তে আস্তে হাঁটিয়া চলিল।

ধূলি-ধূসরিত জন-বিরল গ্রাম্য পথ। দুই পাশে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। যেন উদাসিনী বিরহিণী। দূরে ছায়া-নিবিড় পল্লী—ঝিল্লির ঘুম পাড়ানিয়া গানে যেন মায়ের কোলে শিশুর মত ঘুমাইতেছে। জাহাঙ্গীরের মনে কেমন-যেন উদাস হইয়া গেল।

পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, সে যেন উদাস বাউল, না-জানার সন্ধানে এই পথে পথে গান গাহিয়া ফিরিতে আসিয়াছে। যাহারা তাহার পথে আসিতেছে পরিচিতের রূপে তাহারা তাহার কেহ নয়। যে উদাসিনীর অভিসারে সে চলিয়াছে, সে এই পল্লী বাটের না-জানা উদাসিনী। তাহাকে অনুভব করা যায়, রূপের সীমায় সে অসীমা ধরা দেয় না……

এমন সময় গাড়ীর গো-বেচারী গো-যুগলকে গাড়োয়ান এমন ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল যাহাতে জাহাঙ্গীরের স্বপ্ন এক নিমিষে টুটিয়া গেল। হাসিতে হাসিতে সে পথের ধারেই ধূলার উপর বসিয়া পড়িল। একটু পরে পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল. কেন এ দেশে এত বাউল এত চারণ এত কবির সৃষ্টি হইল। এই উদাস, তপস্বীর ধ্যান-লোকের মত শান্ত নির্জ্জন ঘাট মাঠ যেন মানুষকে কেবলি তাহার আপন অতলতার মাঝে ডুব দিতে ইঙ্গিত করে। এ তেপান্তরের পথের মায়া যেন কেবলি ঘর ভুলায়, একটানা পূরবী সুরের মত করুণ বিচ্ছেদ-ব্যথায় মনকে ভরিয়া তুলে, গৃহীর উত্তরীয় বাউলের গৈরিকে রাঙিয়া উঠে!...

এতক্ষণ যতবার তাহার ভুণীকে মনে পড়িয়াছে, ততবারই তাহার মন অবিশ্বাসের কালিতে কালো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই জন-বিরল উদাস প্রান্তরে আসন্ন সন্ধ্যায় চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, এমনি একটী শান্ত পল্লীপ্রান্তে ছায়া-সুশীতল কুটীর রচনা করিয়া তাহাকে লইয়া সে স্বর্গ রচনা করিতে পারে! কিন্তু...তাহা হইতে পারে না! তাহার পিতার পাপ তাহার রক্তকে কলুষিত করিয়াছে। যে-কোন মুহূর্ত্তে সে তাহার পিতার মতই ব্যভিচারী হইয়া উঠিতে পারে! সে জানে, তাহার রক্তের চঞ্চলতাকে তাহার ভীষণ উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে তাহার কত বেগ পাইতে হইয়াছে। তাহার স্বর তাহার অবয়ব তাহার রক্ত সমস্তই ফররোখ সাহেবের। উহারি মধ্যে যেটুকু জাহাঙ্গীর, তাহা এই পশুর কাছে টিকিতে পারে না! পাপই যদি করিতে হয়, পশুর কবলেই যদি আত্মাহুতি দিতে হয়, তবে সে একাই দিবে, এ পাপের সাথী অন্যকে করিবে না!

তাহার পিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মাথায় যেন খুন

চাপিয়া গেল। বুকের কাছে লুকানো রিভলভারটা এক টানে বাহির করিয়া নিজের ললাটের কাছে ধরিল। আবার কি মনে করিয়া সেটাকে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া গরুর গাড়ীকে পিছনে ফেলিয়া দৃপ্তপদে পথ চলিতে লাগিল।

যাইবার সময় গাড়োয়ানের দিকে রোষ কষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া গেল, শালা, তুমি যদি তাড়াতাড়ি গাড়ী না চালাও, তা হ'লে এই বনের মধ্যে তোমায় মেরে পুঁতে ফেল্‌ব!

গাড়োয়ান বেচারা ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রাণপণে জাহাঙ্গীরের সাথে গাড়ী চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল! জাহাঙ্গীরের রক্তবর্ণ চোখ মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে ইচ্ছা করিলে সত্য সত্যই তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে!......

শিউড়ি যখন তাহারা আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। গাড়োয়ান কাঁদকাঁদ স্বরে বলিল, হুজুর, বলদ দুটো আর বাঁচ্‌বেনা, মর মর হ'য়ে গিয়েছে হুজুর! সারা রাস্তা আমি মেরে দৌড়িয়েঁ নিয়ে এসেছি হুজুর!

জাহাঙ্গীর একটীও কথা না বলিয়া একটা পাঁচ টাকার নোট গাড়োয়ানের হাতে দিয়া গাড়ী হইতে সমস্ত জিনিস নিজে বহিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে আনিল। গাড়োয়ান এই আশ্চর্য্য লোকটীর কোন কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছিলনা। সে আর গোলমাল না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জাহাঙ্গীর তাহাকে ডাকিয়া বলিল, এই! শোন্! বলিয়াই সে ল্যাম্প পোষ্টের কাছে দাঁড়াইয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, দেখ্‌ এই চিঠি যদি ভূণীকে লুকিয়ে দিতে পারিস—তোকে দশ টাকা বখ্‌শিশ দিব। পার্‌বি?

গাড়োয়ান হতভম্ব হইয়া জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

জাহাঙ্গীর তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—শালা হাঁদারাম! হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছিস্ কি? ভূণীকে চিনিস্? হারুণের বোন্?

গাড়োয়ান কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—হুজুর উয়াকে চিন্‌বনা? এইত সেদিন আমাদের কাছে ডেংডিঙেয়ে বড় হঁয়ে উঠ্‌ল!

জাহাঙ্গীর তাহার কাছে গিয়া কণ্ঠস্বর কমাইয়া বলিল, তাকেই পোঁছে দিতে হবে এই চিঠিটা, বুঝ্‌লি? তোর মেয়ে টেয়ে কেউ নেই বাড়ীতে? তার হাত দিয়ে,—বুঝ্‌লি এখন?

গাড়োয়ান একটু কী যেন ভাবিল, তাহার পর বলিল, পার্‌ব হুজুর! দেন!

জাহাঙ্গীর চিঠিটা ও দশ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, কা'ল সন্ধ্যায় আমায় এইখানে পাবি এসে। কী উত্তর দেয়, নিয়ে আস্‌বি। তা হ'লে আরো দশ টাকা বক্‌শিশ, বুঝলি?

গাড়োয়ান আনন্দ-গদগদকণ্ঠে বলিল, হুজুর মা বাপ! কা'লই সন্'ঝে বেলা আমি হাজির হব এসে। হুজুর এই খেনেই থাক্‌বেন ত?

জাহাঙ্গীর "হু" বলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ষ্টেশনের ভিতর চলিয়া গেল।

ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়াই সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। সেখানে ইজি চেয়ারে শুইয়া সাহেবী পোষাক পরা একজন লোক নিশ্চিন্ত আরামে সিগার ফুঁকিতেছিল। জাহাঙ্গীর লোকটাকে আর একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর কাছে গিয়া বলিল, প্রমত্‌দা এখানে?

প্রমত্তও চমকাইয়া উঠিয়াছিল। জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, চুপ! এখানে প্রমত্‌দা বলে কেউ আসেনি! বলিয়াই চতুর্দ্দিকে সতর্ক

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, ব'স এইখানে। তারপর, তুই এখানে কোথা ?

জাহাঙ্গীর সমস্ত বলিল।

প্রমত্ত সমস্ত শুনিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ বেড়াচ্ছিস্ তাহলে উপন্যাসের নায়ক হয়ে! কিন্তু ভাল করিস্‌নি জাহাঙ্গীর তুই এখানে এসে! যাক, তুই আজই কল্‌কাতা চ'লে যা। একটু পরেই ট্রেণ আস্‌বে!

জাহাঙ্গীর বিস্মিত হইয়া বলিল, আর আপনি ?

প্রমত্ত বলিল, আবার প্রশ্ন ? আমার অন্য জায়গায় কাজ আছে।

কী যে কাজ জাহাঙ্গীরের তাহা বুঝিতে বাকী রহিলনা। ইহা লইয়া আর কিছু প্রশ্ন যে সে করিতে পারেনা তাহাও সে জানে। তবু সে একটু ঘুরাইয়া বলিল, আমাকে যে কা'ল পর্য্যন্ত থাক্‌তে হচ্ছে প্রমত্‌দা! বলিয়াই সে হাসিয়া বলিল, থুড়ি, মিষ্টার চাক্‌লাদার!

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, আমার স্যুট-কেসের লেখা নাম প'ড়ে ফেলেছিস্ বুঝি ? কিন্তু দেওয়াল গুলোরও চোখ কাণ আছে রে! একটু সাবধানে কথাবার্ত্তা বলবি। সে যাক, তুই এখানে থাক্‌বি কেন, বল্ ত! আমার জন্য তোর কোন চিন্তা নেই।

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, আপনার নেই, কিন্তু আমাদের ত থাকা উচিত। তা ছাড়া—বলিয়াই একটু থামিয়া চক্ষু নত করিয়া বলিল, কাল চিঠির উত্তর আস্‌বে আমার!

প্রমত্ত হাসিল না। জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া অনেক্ষণ কী ভাবিল। তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল, তবে তুই থাক। কিন্তু খুব সাবধান! পিছনে টিক্‌টিকি লেগেছে! অবশ্য, তোর ভাবনা নেই। কেননা মুসলমান-যুবককে তারা এখনো সন্দেহ করেনি। সাবধানের মার নেই!

প্রমত্ত আবার যেন কী ভাবিতে লাগিল।

একটু পরে সে বলিয়া উঠিল, দেখ্ জাহাঙ্গীর, তোর আচ্কান পায়জামা আছে সঙ্গে ?

জাহাঙ্গীর বলিল, আছে।

প্রমত্ত বলিল, এখ্খুনি নিয়ে আয়! বলিয়াই ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া বলিল, আর বেশী সময় নেই! যা শীগ্গীর আন্!

জাহাঙ্গীর তাহার আচকান পায়জামা আনিলে প্রমত্ত বাথ্রুমে ঢুকিয়া একটু পরে যখন তাহা পড়িয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন জাহাঙ্গীর একটু জোরে হাসিয়া বলিল, আদাব আরজ মৌলবী সা'ব! আপ্‌কে ইল্‌মে শরীফ্!

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, কেফায়েতুল্লা। তারপর নিম্নকণ্ঠে বলিল, আমি যাচ্ছি এখনি! কেমন-যেন গন্ধ পাচ্ছিরে! তুই এইখানেই ঘুমো। দরকার হ'লে ডাক্‌ব! বলিয়াই প্রমত্ত টার্কি-ফেজ মাথায় দিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া গেল!

জাহাঙ্গীর সেইখানে ইজি-চেয়ারে শুইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় সে কাহার ঠেলায় জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সাম্‌নেই একজন ইউরোপিয়ান সাহেব; তাহার পিছনে তিন চার জন বাঙালী বাবু।

সে একটু বিরক্ত হইয়াই ইংরিজিতে বলিল, আপনি কি চান? এরূপভাবে জাগাবার রীতি ভদ্রতা বিরুদ্ধ!

সাহেব একটু থতমত খাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, মাফ কর্‌বেন, আমি আপনাকে আমার বন্ধু মিঃ চাক্‌লাদার মনে করে

ছিলুম। তিনি বোধ হয় এখানেই ছিলেন, বল্‌তে পারেন, তিনি কোথায় গেছেন ?

জাহাঙ্গীর তেমনি বিরক্তির সুরে বলিল, জানিনা কে আপনার চাক্‌লাদার! আমি কাউকেই দেখিনি এখানে।

সাহেব আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল!

জাহাঙ্গীরের বুঝিতে বাকী রহিল না ইনি কোন্ সাহেব

এক অজানা আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। সে আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার বুকের কাছে তাহার শ্রেষ্ঠ বন্ধু—তাহার আত্মরক্ষার অস্ত্র আছে কি না।

প্রমত্তকে সে জানিত। সে জানে, ইহাদের চক্ষে ধূলা দিতে এক জাহাঙ্গীরই যথেষ্ট, প্রমত্তের ন্যায় সেনানীর দরকার করেনা! তবু তাহার কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল!

হঠাৎ অন্য দ্বার দিয়া ঢুকিয়া প্রমত্ত বলিয়া উঠিল, আসসালামো আলায়কুম! ক্যা মিয়া সা'ব শশুরুয়া চলা গিয়া ?

জাহাঙ্গীর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, জি হাঁ! মগর আপ্ ইস্‌ওক্ত্ ক্যোঁও—বলিয়াই এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া গলাখাটো করিয়া বলিল, আপনি সরে পড়ুন প্রমত্‌দা, শ্যাঙাত্‌রা নিশ্চই এই খানেই কোথাও আছে!

প্রমত্ত পরম নিশ্চিন্তভাবে চেয়ারে বসিয়া বলিল, তোকে সে ভাব্‌না ভাব্‌তে হবে না। তুই চল্ দেখি আমার সাথে, এথ্‌খুনি এক জায়গা যেতে হবে।

জাহাঙ্গীর কোনো প্রশ্ন না করিয়া মিলিটারী কায়দায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, রেডি স্যর!

সমস্ত জিনিষপত্র ষ্টেশন মাষ্টারের হেফাজতে রাখিয়া সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, একখানা মোটরের সম্মুখে প্রমত্ত সন্ন্যাসীর সাজে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনে মোটরে উঠিয়া বসিলে মোটর বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিল।

জাহাঙ্গীর বলিল, কি করতে হবে দাদা আমায়, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, আর কেউ হ'লে বলতাম না, আমি তোকে জানি ব'লেই বলছি। একটু দূরেই কোনো গ্রামে যাচ্ছি। সেখানে আমাদের কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে। পুলিসে তা টের পেয়েছে ব'লে খবর পেয়েছি। আজ ভোরের মধ্যেই তা সরিয়ে আর কোথাও রেখে যেতে হবে—আমার ওপর বজ্র পাণির এ হুকুম।

জাহাঙ্গীর আর কিছু প্রশ্ন করিল না। উত্তেজনায় উৎসাহে তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, রাস্তায় যদি পুলিসের সঙ্গে দেখা হয় ?

প্রমত্ত উত্তর দিল না। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া রাস্তার দিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ী থামাইতে বলিয়া একটী ক্ষুদ্র শিশ দিল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ভেদ করিয়া চার পাঁচজন লোক আসিয়া নিঃশব্দে মোটরে বসিতেই আবার মোটর ছুটিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানিক পরে তাহারা একটী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাঁশবন-ঘেরা একটী ক্ষুদ্র মেটে ঘরের সম্মুখে আসিয়া থামিল। জাহাঙ্গীর সেই স্বল্প তারকালোকেই দেখিতে পাইল, গাড়ী থামিবামাত্র একটী স্ত্রীলোক দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রমত্ত গিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

প্রমত্তের ইঙ্গিতে সকলে নামিয়া পড়িল এবং সকলের সাথে জাহাঙ্গীরও মহিলাটীকে প্রণাম করিল, কিন্তু সে যেন দায়ে পড়িয়া।

ঘরের ভিতরে গিয়া স্বল্প দীপালোকেই জাহাঙ্গীর যে মহীয়সী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিল, তাহাতে এই নারীকে প্রণাম করিতে গিয়া তাহার মন যেটুকু বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার জন্য নিজেকে ধিক্কার না দিয়া পারিল না।

মহিলার বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশের বেশী হইবে না। পরণে শুধু একখানি পরিষ্কার সাদা ধুতি। যেন গায়ের রংএর সাথে মিশিয়া গিয়াছে। ঘাড় পর্য্যন্ত ছোট করিয়া কাটা চুল—অনেকটা বাব্‌রি চুলের মত। তাহারি কতকগুলো ললাটে ও মুখের আশে পাশে আসিয়া পড়িয়াছে। বড় বড় চক্ষু কিন্তু তাহা যেন একটু অতিরিক্ত প্রখর, সহজে চোখের দিকে চাওয়া যায় না। চোখ যেন ঝল্‌সিয়া যায়। মুখ পুরুষের মত দৃপ্ত, মহিমোজ্জ্বল!

জাহাঙ্গীর মনে মনে বলিল, নারী যদি নাগিনী হয়, তুমি নাগেশ্বরী।

জাহাঙ্গীরের চিন্তায় বাধা পড়িল। প্রমত্ত নিম্নস্বরে বলিল, এদের সবকে বুঝি চেননা জয়তী দি'?

জাহাঙ্গীর মনে মনে বলিল, তুমি সত্যই জয়তী দেবী! জীবনে সে বুঝি এই প্রথম নারীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিল। জয়তি দেবী সকলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এ ছেলেটীকেত আগে দেখিনি!

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, এ পথ-ভোলা ছেলে দিদি। এ আমাদের গোষ্ঠির নয়।

প্রমত্তের এই কথায় অন্যান্য সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। শুধু জয়তী দেবী বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে জাহাঙ্গীরকে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, তোমার মা বেঁচে আছেন?

জাহাঙ্গীর উত্তর করিল, আছেন! জয়তি যেন আরো আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, দিদি বোধ হয় ভাবছ, মা থাক্‌তে ওর অমন লক্ষ্মীছাড়ামত চেহারা কেন, না? সত্যিই ও লক্ষ্মীছাড়া। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌তে পেরেছে ব'লেই ওকে দলে নিয়েছি।

জয়তীর প্রখর চক্ষু স্নেহে কোমল হইয়া আসিল। স্নেহ-সিক্তকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, তুমি আমায় দিদি না ব'লে মাসিমা ব'লে ডে'কো, কেমন? বলিয়াই জয়তী অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

জাহাঙ্গীর ব্যতীত আর সকলেরই চক্ষু জলে পূরিয়া উঠিল! জয়তীর এই অনুরোধের অর্থ বুঝিতে তাহাদের বাকী রহিল না।

জয়তীর ছোট বোন্ সন্তান-প্রসব করিয়াই মারা যায়। সেই ছেলেকে জয়তী লইয়া আসিয়া মানুষ করেন। নাম রাখেন পিণাক পাণি। সকলে পিণাকী বলিয়া ডাকিত। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া গত বৎসর তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে!

যেদিন পিনাকীর ফাঁসি হয়, সেইদিনই জয়তী গঙ্গাস্নান করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া স্বয়ং বজ্রপাণির কাছে স্বদেশী মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। আজ জয়ন্তী বিপ্লবীদের শক্তি-স্বরূপা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

জয়তীব ঐ উক্তির পর সকলে এমন-কি প্রমত্ত পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, জাহাঙ্গীরের সঙ্গে পিণাকীর বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

পিণাকীকে বিপ্লব-সঙ্ঘের সকলেই অতিরিক্ত স্নেহ করিত। সে ছিল তাহাদের দলের বয়োকনিষ্ঠদের অন্যতম। তাহা ছাড়া, সে যাইত সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাহসের কাজে সর্ব্বাগ্রে।

মৃত্যুকে সে রাঙ্গা উত্তরীয়ের মত সারা গায়ে জড়াইয়া ধরিতে চাহিত!

তাহার ফাঁসির দিন বজ্রপাণি হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লবীদের প্রত্যেকে শিশুর মত রোদন করিয়াছিল।

ফাঁসির পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি কি কাউকে দেখ্‌তে চাও?

পিণাকী হাসিয়া বলিয়াছিল, চাই, কিন্তু তুমি তা দেখাতে পার্‌বে না!

ম্যাজিষ্ট্রেট তার শিশুর মত মুখের পানে তাকাইয়া জোরের সঙ্গে বলিয়াছিল, নিশ্চয়ই পার্‌ব! বল কা'কে দেখ্‌তে চাও!

পিণাকী তেমনি মধুর হাসিতে মুখ আলো করিয়া বলিয়াছিল, আমি চাই ভারতের স্বাধীনতা দেখ্‌তে! পার্‌বে দেখাতে?

ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ তাহার মাথার টুপি খুলিয়া বালককে অভিবাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিয়াছিল, আমি তোমায় প্রণাম করি বালক! মৃত্যু-মঞ্চই তোমার মত বীরের মৃত্যুঞ্জয়ী সম্মান। তোমার মত বীরের বন্দনা কর্‌বার সম্বল জীবনের নাই।

আজ জয়তী দেবীর জাহাঙ্গীরের প্রতি এই অদ্ভুত অনুরোধ শুনিয়া সকলের সেই সব কথাই স্মরণ হইতে লাগিল!

একটু পরেই জয়তী আসিয়া বলিলেন, তোমরা তোমাদের কাজ কর গিয়ে, আমি একটু ওর সঙ্গে আলাপ করি।

প্রমত্ত অন্যান্য ছেলেদের লইয়া চলিয়া গেল! জাহাঙ্গীর একা কেমন একটু অশ্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

জয়তী কাছে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমায় পিণাকী ব'লে ডাক্‌ব, কেমন?—কণ্ঠ তাঁর যেন ভাঙ্গিয়া আসিল।

জাহাঙ্গীরের চক্ষে এতক্ষণে যেন এই রহস্যের কুহেলিকা কাটিয়া গেল। এখন সে বুঝিতে পারিল, কেন জয়তী দেবী তাহাকে মাসিমা বলিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারও চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চক্ষু বহিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ সে বলিল, তুমিই কি বীর পীনাকীর মাসিমা?

জাহাঙ্গীরের এই তুমি সম্ভাসণে এমন পাষাণ প্রতিমার মত কঠিন জয়তীও যেন ভাঙিয়া পড়িলেন। জাহাঙ্গীরের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, হাঁ বাপ, আমিই সে দুর্ভাগিনী। তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, তোকে দেখ্‌তে অনেকটা পিনাকীর মত।

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, তুমি দুর্ভাগিনী নও মাসিমা, ভাগ্যবতী! কিন্তু সে যাক, তোমায় না ভেবে ছুঁয়ে ফেলেছি, তোমায় হয়ত আবার স্নান কর্‌তে হবে!

জয়তী বেদনায় নীল হইয়া বলিলেন, ওকথা বলিস্‌নে বাবা, ও কথা শুন্‌লেও পাপ হয়। মানুষকে মানুষে ছুঁলে স্নান কর্‌তে হয়, মানুষের এত বড় অবমাননাকর শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল ব'লেই আমাদের এই দুর্দ্দশা। জানিনে তুই কি জাত, কিন্তু তুই যদি হাড়ি-ডোমও হতিস তা হ'লেও তোকে ছুঁতে এতটুকু ইতস্ততঃ হ'তনা আমার! ওরে, জন্মটাত দৈব। যেদিন আরেক জনকে আরেকজাতের ভেবে ঘৃণা কর্‌ব, সেই দিনই

আমার স্বাধীনতার মন্ত্র আমার কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে! তা ছাড়া, তোরা ত আগুনের শিখা, তোদের ছোঁয়ায় যে সব অশুচি শুচি হয়ে ওঠে বাবা!

জাহাঙ্গীর অবাক হইয়া জয়তীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, এই যদি আমাদের অন্তরের কথা হয় মাসিমা, তা হ'লে এই আমাদের সবচেয়ে বড় মন্ত্র। আর শুধু এই মন্ত্রের জোরেই বিনা রক্তপাতে আমরা ভারত স্বাধীন করতে পারব।

এমন সময় অন্য ঘর হইতে জয়তীর একমাত্র কন্যা ঘুম হইতে জাগিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

জয়তী কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, এই খানে উঠে আয় চম্পা, তোর একজন নতুন দাদা এসেছে।

চম্পা আলুথালু বেশে তাহার মাতার নিকট আসিয়া বলিল, কই মা? বলিয়াই জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল।

জয়তী মলিন হাসি হাসিয়া বলিলেন, ওকে অনেকটা পিনাকীর মত দেখাচ্ছে না?

পিনাকীর নাম করিতেই চম্পার দুই চোখে অশ্রুর বান ডাকিল। সে সেই অশ্রু সিক্ত চক্ষু দিয়া জাহাঙ্গীরকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, দাদাকে কি ব'লে ডাকব মা?

জয়তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দাদাকে আবার কী ব'লে ডাকবি? দাদাই বলবি!

চম্পা লজ্জা পাইয়া জয়তীর পশ্চাতে আসিয়া মুখ লুকাইল!

জাহাঙ্গীর দেখিল, চম্পা যেন শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ। সহসা তাহার ভূণীকে মনে পড়িল।......ইহারা মায়াবিনীর জা'ত! ইহারা সকল

কল্যাণের পথে মায়া-জাল পাতিয়া রাখিয়াছে। ইহারা গহন-পথের কণ্টক, রাজপথের দস্যু। সে নিশব্দে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, দূরে বনানীর অন্ধকারে নিশীথের চাঁদ মলিন-মুখে অস্ত যাইতেছে, আর পূর্ব্ব-গগন নবারুণের উদয়-আশায় রঙিয়া উঠিতেছে!

১২

জাহাঙ্গীর কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াই দেখে দুই তিনখানা টেলিগ্রাম আসিয়া পড়িয়া আছে। একখানা দেওয়ানজীর, দুইখানা তাহার মায়ের প্রেরিত। উঠাউঠি দুইখানা টেলিগ্রাম করিয়াও তাহার উত্তর না পাইয়া স্নেহ-বৎসলা জননী আবার "রিপ্লাই পেড" টেলিগ্রাম করিয়াছেন। এইবার উত্তর না দিলে দেওয়ানজীকে লইয়া তিনি নিজেই কলিকাতা আসিয়া তাহাকে পাকড়াও করিবেন, এমন ইঙ্গিতও দিয়াছেন টেলিগ্রামে।

জাহাঙ্গীরের মাতা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না যে তাঁহার পুত্র বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছে, বা সে কলিকাতায় মাঝে মাঝে থাকে না—ঐ মন্ত্রের উপাসনার জন্য। কাজেই তিনি মনে করিতেছিলেন, হয় জাহাঙ্গীর পীড়িত, নয় সে ইচ্ছা করিয়াই উত্তর দিতেছে না।

জাহাঙ্গীর ভয়ে ভয়ে শেষ টেলিগ্রামের তারিখ দেখিয়া বুঝিল, ও টেলিগ্রামও দুই দিন আগেকার। সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইল, টেলিগ্রাম লেখা দেখিয়া। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে জানিতে পারিল না, কে তাহার টেলিগ্রাম খুলিয়াছে। শেষে তাহার বুঝিতেও বাকী রহিল না, এ কীর্ত্তি কাহাদের। সে শ্রান্তভাবে ধূলি-ধূসরিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে গলা-ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল, "নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে!"

তখন কুন্তীর মিঞা ছাড়া আর প্রায় সকলেই আপন আপন কাজে বা কলেজে চলিয়া গিয়াছে। কাজেই কেহ আসিয়া আর জাহাঙ্গীরের অনুপস্থিতি লইয়া প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিল না।

আসিল কেবল কুন্তীর মিঞা তাহার ভুঁড়ি আন্দোলিত করিতে করিতে। কিন্তু সে ঘরে ঢুকিয়া জাহাঙ্গীরের মূর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। জাহাঙ্গীরের এমন ছন্নছাড়া মূর্তি সে যেন আর কখনো দেখেনি। দুঃখে, বেদনায়, বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জাহাঙ্গীর বুঝিতে পারিয়া গম্ভীরভাবে কুন্তীর মিঞার ভুঁড়িতে তাকিয়া থাপড়ানোর মত করিয়া থাপ্‌পড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি উল্‌ঝলুল্! দেখ্‌ছিস্ কি হাঁ ক'রে? আমি কি তোর বৌএর ছোট বোন্?—বলিয়াই সিগারেট-কেস আগাইয়া দিয়া হুস্ করিয়া তাহার মুখের উপর একরাশ ধোঁওয়া ছাড়িয়া দিল।

অন্য দিন হইলে কুন্তীর মিঞা ছাড়িয়া কথা বলিত না। কিন্তু আজ সে সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া গেল। সে কত কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কত কথা জানাইবে বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সব যেন তাহার গুলাইয়া গেল জাহাঙ্গীরের এই চেহারা দেখিয়া। জাহাঙ্গীরকে সে এতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, তবু সে যেন বিস্ময়ের দেশের রাজকুমার মায়াবী। উহাকে শুধু দেখিতে হয়, বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। অথবা সে উন্মাদ।

ভাবিতে ভাবিতে সে নীরবে সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল। জাহাঙ্গীরও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ঘুমে তখন তাহার চক্ষু যেন জড়াইয়া আসিতেছে। পুলিশের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য আজ তিন দিন তিন রাত্রি তাহার নিজের চক্ষুকে নিস্তন্দ্র নির্ঘুম করিয়া রাখিতে

হইয়াছে। সে জানিত, সে এতটুকু অবহেলা করিলে তাহার সহিত আরো বহু যুবকের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সে ক্ষণে ক্ষণে নানান্ রূপের আড়ালে নিজেকে লুকাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু আজ আর যেন সে পারে না।

সব চেয়ে বেশী ভয় হইতে লাগিল তাহার মাত'র টেলিগ্রাম দেখিয়া। যদিই তিনি কলিকাতায় আসিয়া পড়েন। কিন্তু কেন যে তাহাকে কুমিল্লা যাইবার জন্য এত অনুরোধ, তাহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার মা' ত জানেন, জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ এবং অপারগ—দুইই।

কুন্তীর মিঞা এক নিঃশ্বাসে তিন তিনটা সিগারেটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, এই! চা খাবি?

জহাঙ্গীর লাফাইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, দে না ভাই লক্ষ্মীটী! বলিয়াই কুন্তীর মিঞার দাড়ীতে হাত বুলাইয়া চুমু খাইল।

কুন্তীর মিঞা ম্লান হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। একটু পরে চা লইয়া আসিয়া দেখিল, জাহাঙ্গীর শেভ্ করিতে বসিয়া গিয়াছে।

এক পাশের আধ-কামানো গাল লইয়াই জাহাঙ্গীর চায়ের কাপ টানিয়া লইল। চা খাইতে খাইতে বলিল, দেখছিস্ মুখের অবস্থা? আজ সাত দিন ক্ষৌরী না ক'রে মুখে যেন ধান কাটা মাঠের মত হয়ে উঠেছে! বলিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, হাত বুলোতে মনে হচ্ছিল, যেন কাটা-ধানের নাড়ার ওপর দিয়ে বাব্‌লা গাছ টেনে নিয়ে যাচ্ছে!—আবার সেই হাসি!

কুন্তীর মিঞা এতক্ষণে যেন একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া বলিল, উঃ, এতক্ষণে যেন মেঘ কাট্‌ল! ভাগ্যিস্ চায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, নৈলে এমন

বিপদে বিপদহন্ত্রীর বেশে আর কে দেখা দিত! বলিয়াই রাস্তার কাঁসারীর কংস নিনাদের মত বাজখাঁই হাসি!

জাহাঙ্গীরও সে হাসিতে যোগদান করিয়া বলিল, যা বলেছিস্! চা আর সিগারেট—যেন একসঙ্গে বৌ আর আর ছোট শালি!—আঃ, কি চা-ই করেছিস্! তোর শালির বিয়েতে আমি চাল্‌নি দিয়ে জল বয়ে দিব! কুন্তীর মিঞা জাহাঙ্গীরের উরুতে এক রাম-থাপ্‌পড় কসাইয়া বলিয়া উঠিল, তুই কি এমনই সতী!

জাহাঙ্গীর উরুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, তুই ভীম হ'তে পারিস্. তাই ব'লে আমি দুর্য্যোধন নই! এখনি উরুভঙ্গ হয়েছিল আর কি!

কুন্তীর মিঞা এতক্ষণে যেন কূল পাইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, দুর্য্যোধনের মত কোন্ হ্রদে লুকিয়েছিলে বল ত?

জাহাঙ্গীর কোন উত্তর দিল না। চা শেষ করিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে দাড়ি কামাইতে লাগিল।

কুন্তীর মিঞা বলিয়া উঠিল, আরে তোমায় খবর দিতে ভু'লে গেছি, তোমাদের দেওয়ানজী এসেছেন যে!

জাহাঙ্গীর চমকিয়া উঠিতেই খানিকটা গাল কাটিয়া গেল। ক্ষতস্থানটা চাপিয়া ধরিয়া জাহাঙ্গীর বলিয়া উঠিল, কোথায় তিনি? কখন এসেছেন?

কুন্তীর মিঞা বিস্মিত নেত্রে জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, তা ত জানিনে। তবে তিনি কা'ল দু' তিনবার এসেছিলেন তোমার খোঁজ কর্‌তে। আজও সকালে একবার এসেছিলেন যেন। যাক, তোর চিন্তার কিছু নেই। তিনি নিজেই আজ আর একবার অন্ততঃ আস্‌বেন।

জাহাঙ্গীর কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল, এবং একটু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে দাড়ি কামাইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। স্নান করিয়া ফিরিয়া সে শুইয়া পড়িয়া বলিল, আমি এখন একটু ঘুমুব। শরীরটা কেমন খারাপ কর্‌ছে যেন। দেওয়ানজী এলে আমায় উঠিয়ে দিস।

জাহাঙ্গীরের যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা গড়াইয়া পড়িয়াছে। ঘুম ভাঙিতেই দেখিল, সাম্‌নে চেয়ারে বসিয়া দেওয়ানজী। জাহাঙ্গীর উঠিয়া শশব্যস্তে তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

দেওয়ানজী তাহাকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, বাবা, বেগম-মা অস্থির হয়ে উঠেছেন। তুমি এখনি চল। আজ দু' দিন তিনি না খেয়ে আছেন।

জাহাঙ্গীর কুঁজো হইতে জল গড়াইয়া লইয়া চোখে মুখে দিতে দিতে বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মা ? মাও এসেছেন নাকি ?

দেওয়ানজি বলিলেন, হাঁ বাবা, তোমার কোনো খবর না পেয়ে অসুখ-বিসুখ হয়েছে মনে ক'রে কা'ল আমরা এসেছি। এসে অবধি তোমায় খুঁজ্‌ছি। তুমি সাতদিন ধ'রে এখানে সেই শুনে তিনি সেই যে শয্যা নিয়েছেন, আর ওঠেননি। কেউ এতটুক পানি মুখে দিতে পারেনি।

জাহাঙ্গীর জামা পরিতে পরিতে ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ বাড়ীতে উঠেছেন এসে ?

দেওয়ানজি উঠিতে উঠিতে বলিলেন, লোয়ার সাকুর্লার রোডের বাড়ীতে। অন্য বাড়ী ত সব ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে। ওটাই শুধু খালি হয়েছে মাত্র সেদিন। বলিয়াই একটু থামিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি ত কোনো খবরই রাখনা বাবা। নিজের বাড়ী ঘর গুলোরও না।

জাহাঙ্গীর উচ্চবাচ্য না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দেওয়ানজী নামিতে নামিতে দীর্ঘঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, কি চেহারা হয়েছে তোমার, দেখ ত! কে বলবে নওয়াব বাড়ীর ছেলে, যেন পথের ভিখিরী!

জাহাঙ্গীর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি ত সত্যিই ভিখিরী দেওয়ান সাহেব! বাপের জমিদারী, ও ত আমি অর্জ্জন করিনি!

জাহাঙ্গীরের চোখে মুখে এক অব্যক্ত ব্যথার ছাপ ফুটিয়া উঠিল। দেওয়ানজি কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের মত তাকাইয়া থাকিলেন।

মোটরে যাইতে যাইতে জাহাঙ্গীর সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দেওয়ান সাহেব, খবর সব ভাল ত? এত ঘন ঘন টেলিগ্রাম করা কেন বলুন ত। এ অকর্ম্মন্যকে নিয়ে কেন এ অনর্থক টানাটানি? তাহার সুরে কথায় তিক্ত শ্রান্তি ফুটিয়া উঠিল।

দেওয়ানজি ষ্টেট্ চালাইয়া ঝানু হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানুষের বিশেষ করিয়া আজকালকার যুবকদের অন্তর লইয়া কখনো তাঁহার মাথা ব্যথা হয়ও নাই, আর চেষ্টা করিয়াও ওর কূল পাননা। তবু তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, তরুণ যুবক হয়ত বা কোথাও লভ্ টভ্ করিয়া বসিয়াছে। তিনি মনে মনে এ রোগের ওষুধের কথা চিন্তা করিয়া প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

বলিয়া উঠিলেন, খবর ভালই বাবা। শুধু আমাদের বেগম-মা জিদ ধরেছেন, তিনি মক্কা যাবেন হজ কর্‌তে। আর এক হপ্তার মধ্যেই জাহাজ ছাড়্‌বে। তিনি তোমায় সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে যেতে চান। তাই এত তাড়াতাড়ি।

জাহাঙ্গীর আর শুনিতে পারিল না। কেমন-যেন-এক অজানা আতঙ্কে সে প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অসহায় ভাবে মোটরে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, দেওয়ান সাহেব, এখন থাক, মার কাছে গিয়েই সব শুন্‌ব !

১৩
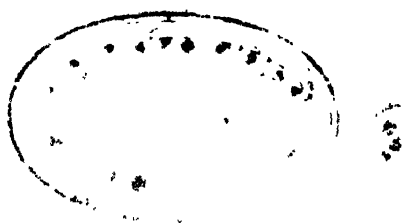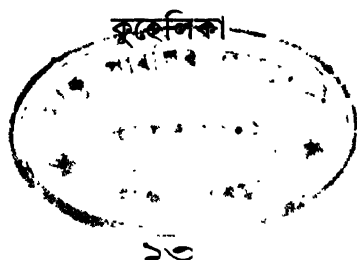
জাহাঙ্গীর আসিয়া পৌঁছিতেই তাহার মাতা একেবারে তাহাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, খোকা, এ কি চেহেরা হয়েছে তোর ?

জাহাঙ্গীর কিছু না বলিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। জননী উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিতে করিতে নীরবে ছেলের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গীর হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, তোমার খাওয়া হয়নি দু'দিন থেকে ? আগে খেয়ে নাও তারপর সব কথা হবে।

অনিচ্ছা স্বত্বেও পুত্রের পীড়াপীড়িতে তাঁহাকে উঠিয়া খাইয়া আসিতে হইল।

জাহাঙ্গীর ততক্ষণে ঘরের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, সত্যসত্যই কোনো দূরদেশে যাইবার জন্যই তাহার মা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না, মায়ের এ অভিমান কাহার উপর। সে সংসারী হইল না, ঘর সংসারের কোনো কিছু দেখিল না শুনিল না বলিয়াই মা স্বেচ্ছায় সংসার হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। এ হয়ত অভিমান করিয়া পুত্রকে শাস্তিই দিতেছেন তিনি। জাহাঙ্গীর গভীর দীর্ঘঃশ্বাস মোচন করিয়া একটা সোফায় বসিয়া অস্ত আকাশে রংয়ের খেলা দেখিতে লাগিল। রং ত নয়, ও মায়া, স্বপন। ও রং লাগিতেও যতক্ষণ, মুছিতেও ততক্ষণ।

ঐ গোধূলি বেলার রংএর মত সুখের স্বপ্নের ছোপ তাহার চিত্তে লাগিয়াই আবার পরক্ষণে মুছিয়া যায়। ঐ অস্ত আকাশের মতই নির্লিপ্ত তার মন। কত রং আসে, খেলিয়া যায়, তাহার পরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় কঠোর বাস্তবের দিবালোকে। এই রংএর মায়ায় সে ভুলিবেনা। ইহাকে প্রশ্রয় দিবে না। তাহার কাছে শুধু দিনের আলো আর রাতের আঁধারই সত্য। নিষ্ঠুর বাস্তবতা আর অসীম দুঃখ সূর্য্যালোক আর অঁাধারের মত তাহার জীবনকে জড়াইয়া আছে। ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছু, তাহা কেবলি রংএর মায়া, মরীচিকার প্রতারণা।

সে কি করিবে ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু বেশী ভাবিবার অবকাশও সে পাইল না। মাতা খাইয়া আসিয়া পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, সত্যি বল্ দেখি খোকা, তোর কি হয়েছে! দিন দিন তোর চেহারাই বা অমন হচ্ছে কেন? কি হয়েছিস্, একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখ্ দেখি।

জাহাঙ্গীরের মেসে বড় আয়না ছিল না। তাছাড়া চুলটুল চিরুণীও করে সে সাধারণতঃ কম। করিলেও এত অন্যমনস্ক ভাবে করে, যে তাহার নিজের চেহারার দিকে লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা তাহার থাকে না। মায়ের কথায় হঠাৎ সাম্‌নের বড় আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজেকে এতদিন পরে ভাল করিয়া দেখিল। দেখিয়া লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। সত্যই তাহার চেহারা অতিমাত্রায় লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গিয়াছে। এই ঘরে তাহাকে যেন মানাইতেছিল না।

তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, রাজবাড়ীতে ভিক্ষুককে যেমন অশোভন দেখায়, তাহাকে তেমনি বিশ্রী বেখাপ্‌পা দেখাইতেছে। সে মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

সে জানে, এই রাজ-ঐশ্বর্য্য এই ঘর বাড়ী ধন-দৌলত সমস্ত তাহারই একদিন হইবে। অথবা ইচ্ছা করিলে আজই সে এ সবের মালিক হইতে পারে। তবু তাহার মন কেন যেন কেবলি বলিতে লাগিল, এ ঐশ্বর্য্য আর কারুর, এ তোর নয়, তোর নয়। কেন যে তাহার মন এত বড় অধিকার এত বেশী ঐশ্বর্য্যকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না, তাহা সে নিজেই জানে না।

দেশের কাজে নিয়তই তাহাকে দুঃখী আতুরদের মাঝেই বেশীর ভাগ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। তাহাদের শত অপরাধের মাঝে থাকিয়াও ত সে এ অশ্বস্তি অনুভব করে নাই। বরং পরম শান্তির সঙ্গে এই দুঃখের দৈন্যের বুকে বসিয়া সে ভাবিয়াছে, সে যেন এই দৈন্য-দুঃখপীড়িত দলেরই একজন। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন মায়া তাহার জন্য নয়। সে ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণা করে, ঐশ্বর্য্যশালীদের ঘৃণা করে। উহারাই সকল পাপের মূল। উহারাই শয়তানের গুপ্তচর। ঐ ঐশ্বর্য্যই সকল অকল্যাণের হেতু।

তাহার জন্মবৃত্তান্ত আজ তাহার কাছে অবিদিত নাই। ইহা লইয়া প্রথমে যে চিত্তবিক্ষোভ হইয়াছিল, তাহারও অনেকটা আজ প্রশমিত হইয়া গিয়াছে—তাহার আত্ম অবহেলায় আত্ম নির্য্যাতনেও প্রমত্তের উপদেশ। তবু তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ যদি তাহার মা ঐ দুঃখীদের মতই একজন হইত, সে আজ এমন করিয়া মাকে পর ভাবিতে পারিত না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, এই বাহিরের ঐশ্বর্য্যেই তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য্যকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। মনে মনে বলিল, দেবতার অভিশাপের মতই দেবতার বরও ব্যর্থ হইবার নয়; সুতরাং এ বরের বর্ব্বরতা যেদিন তাহার স্কন্ধে আসিয়া চড়িবে, সেদিন সে যেন তাহাকে পরিপূর্ণ চিত্তে অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিতে পারে।

এই সোনার লঙ্কাকে দগ্ধ করিতে পারে। বহু সীতার চোখের জলে এ লঙ্কা কলঙ্কিত।

বেদনাতুর আঁখি তুলিয়া মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ভাব্‌ছিস্ খোকা অমন ক'রে? কি হয়েছিস তুই? কেবলি কি যেন ভাবছিস। কথা কইছিস অন্যমনস্ক হ'য়ে। যেন অন্য বাড়ীর ছেলে। আমার যে কত কথা আছে তোর সাথে!

জাহাঙ্গীর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, বড্ডো শরীরটা খারাপ লাগ্‌ছে মা। আমি একটু শুই, শুয়ে শুয়ে সব কথা শুন্‌ব তোমার। তা'ছাড়া পরীক্ষা কাছে কিনা, এবার পাশ কর্‌তে পার্‌ব কিনা ভাব্‌ছি।

মাতা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দেখ্, মার মন অন্তর্য্যামী। আমার কাছে তোর আর লুকাতে হবে না। তোর মনের কথা না বলিস না-ই বল্‌লি, তবু এ লুকোবার চেষ্টা করিস্‌নে। আর, পরীক্ষায় ফেলের কথা? তুই ত চিরকালই না প'ড়েই পাশ ক'রে এলি। আমি জানি, এবারও তুই পাশ কর্‌বি। কিন্তু তুই ত ও কথা ভাবছিস্‌নে, অন্য কি কথা ভাব্‌ছিলি বল্!

জাহাঙ্গীর বিছানায় শুইয়া পড়িল, উপরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিল।

একটু থামিয়া ধরা গলায় মা বলিয়া উঠিলেন, খোকা আমি মা, আমি তোর মনের কথা যেন সব বুঝি। আচ্ছা বাবা, তোর কথায় আমি ত খেলুম, এখন তুই এ বাড়ীর কিছু খাবি কি? তুই পেটের ছেলে, তবু যেন ও অনুরোধটুকু কর্‌তেও আমার ভয় হয়! বলিতে বলিতে কান্নায় মাতার স্বর জড়িত হইয়া গেল!

জাহাঙ্গীরকে কে যেন চাবুক দিয়া আঘাত করিল। সে জ্যা-ছিন্ন ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, মা! মা! তোমার পায়ে পড়ি, আর অমন ক'রে ব'লো না। আমিও আজ তিন দিন থেকে শুধু চা খেয়ে আছি। এতক্ষণ বলিনি। খাবার আন, তুমি খাইয়ে দেবে!

মা জাহাঙ্গীরকে বুকে জড়াইয়া "খোকা" বলিয়া ডাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, কি নিষ্ঠুর তুই খোকা, নিজে না খেয়ে আছিস তিন দিন, আর তা লুকিয়ে আমায় মাথার দিব্যি দিয়ে খাওয়ালি?

জাহাঙ্গীর দুষ্টু ছেলের মত আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, বা রে, তুমি বুঝি জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি খেয়েছি কি না?

চোখে আঁচল দিয়া মাতা চলিয়া গেলেন। পরিপাটি করিয়া ছেলেকে খাওয়াইবার পর মাতা বলিলেন, তুই এখন শো দেখি। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সব কথা বলি।

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, আর সব কথা বল্‌তে হবে না তোমায়। আমি সব জানি। এরি মধ্যে হাজিবুড়ি হ'তে যাচ্ছ এই ত!

মাতা হাসিয়া বলিলেন, তা বুড়ো ত হয়েছি বাবা। এইবার তোর জিনিষ তুই নে। আমি আর যখের ধন আগ্‌লাতে পারিনে।

জাহাঙ্গীরও তরল হাসি হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ যক্ষ ভূত হয়ে আমিই এ টাকাকড়ি নিয়ে পাহারা দিই! তা মা, জ্যান্ত ছেলেকে ত যখ্‌ দেওয়া যায় না!

মা ছেলের মুখ চাপিয়া বলিলেন, তুই থাম্ খোকা। ষাট্! বালাই! নিতে হবে না তোকে কিছু। দেওয়ান সাহেবই সব দেখ্‌বেন।

তুই ঘরেরও হবিনে। অথচ আমায়ও মুক্তি দিবিনে। আমি কত দিন আর এ শাস্তি বইব, বল্ ত!

জাহাঙ্গীর দুষ্টুমীর হাসি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা মা, আমি যদি তোমার বৌমা এনে দিই, তা হ'লে হজ কর্‌তে যেতে পার্‌বে?

মা যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া বলিলেন, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক খোকা! ও অদৃষ্ট নিয়ে আমি আসি নি। বাড়ীতে যদি আমার বৌমা আসে, তুই ফিরে আসিস্, তাহ'লে কাজ কি আমার মক্কায়, হজে! ওই হবে আমার মক্কা কাবা সব!

জাহাঙ্গীর হো-হো করিয়া মায়ের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, বল কি মা, তোমার বৌমাই হবে সব! কাবার চেয়েও বড়! বলিয়াই কৃত্রিম দীর্ঘঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক, আমিই বানে ভেসে এসেছিলুম!

মা এইবার রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, চুপ কর্ হতভাগা ছেলে! যা নয় তাই বলা হচ্ছে! বলিয়াই স্নেহ-বিগলিত স্বরে বলিলেন, সত্যি খোকা বল্, তুই আমার ঘরে বৌ এনে দিবি? আর ভূতের মত একলা বাড়ী আগ্‌লাতে পারি নে! কেমন? তাহ'লে জিনিষপত্র খুল্‌তে বলি? বলিয়াই হাঁক-ডাক দিতে আরম্ভ করিলেন, ওরে মোতিয়া দেওয়ানজিকে একবার খবর দে ত!

মোতিয়া বাড়ীরই যুবতী ঝি। সে এতক্ষণ সব শুনিতেছিল আড়ালে থাকিয়া। এই খোশ্‌খবরে সে আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, ব্যাগম আম্মা, আপনি দেইখ্যা বুঝ্‌বার পার্‌ছেন না, ভাইজানের মুখ

ক্যামন্ শুরুষ্‌কু অইয়া গিয়াছে! জোয়ান পোলার সাদি না দিলে সে ব্যাওরা অইয়্যা যাইব না?

জাহাঙ্গীর হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। মাও হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, তুই যা দেখি, আগে দেওয়ান সাহেবকে ডেকে আন্, তারপর তোর ভাইজানের সাদির কথা হবে।

জাহাঙ্গীর বলিয়া উঠিল, তার আগে মা তোমার সব কথা ভাল ক'রে শোনার দরকার।

মোতিয়া তাহার কাজলায়িত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেল।

মাতা পুত্রের রুক্ষ চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন, কতদিন তেল মাখিস্‌নি খোকা, বল্ ত! তুই কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবি শেষে?

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, কিন্তু তুমি ত সন্ন্যাসী হ'তে দিবেনা না। সে যাক্, তুমি যে আসল কথাটাই শুন্‌তে চাচ্ছ না!

মা হাসিয়া বলিলেন, সে কথা না শুন্‌তেই আমি বুঝেছি। সে মেয়েটী কোথায় থাকে বল্, তারপর আমার যা কর্‌বার আমি কর্‌ব।

জাহাঙ্গীর লজ্জিত হইয়া বলিল, তুমি যা মনে কর্‌ছ মা, তা নয়। আমি তোমার কাছে কিছু লুকোবনা। সব শুনে তুমি যা কর্‌তে বল্‌বে তাই করা যাবে।

জাহাঙ্গীর হারুণদের বাড়ী যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উন্মাদিনী মাতার কীর্ত্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। বলিলনা শুধু তাহার বিপ্লবীদলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার কথা।

মাতা বিস্ময়াভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কোনো কথা উচ্চারিত হইল না। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখে আনন্দ ও শঙ্কার আলোছায়া খেলিয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ জাহাঙ্গীর বলিয়া উঠিল, কিন্তু মা তাকে কিছুতেই এ বাড়ীতে আনা যেতে পারে না। তোমাকে বল্‌তে ভুলে গেছি—সে অতিমাত্রায় অহঙ্কারী মেয়ে। আমার মা গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আন্‌লে তবে নাকি তিনি আমাদের ঘরে শুভ পদার্পণ কর্‌লেও কর্‌তে পারেন। বিষ নেই মা, কিন্তু ফণা-আস্ফালন আছে!

মা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, সে ঠিকই বলেছে খোকা। তা যদি সে না বল্‌ত, আমি তাকে আন্‌বার কথা ভাব্‌তে পার্‌তুম না। যে সাপ ফণা ধরে—তার বিষও থাকে, সে জাত-সাপ।

জাহাঙ্গীর ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি কি তাকে এ বাড়ীতে আন্‌বে মা?

মা হাসিয়া বলিলেন, তা আন্‌তে হবে বৈ কি! খোদা নিজে হাতে যে সওগাত পাঠিয়েছেন, তাকে মাথায় তু'লে নিতে হবে।

জাহাঙ্গীর ক্লান্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কিন্তু মা আমি ত তাকে বিয়ে কর্‌তে পারি না। তাকে কেন, কাউকেই বিয়ে কর্‌বার অধিকার আমার নেই!

মা চমকিয়া উঠিয়া কি ভাবিলেন। তাহার পর আদেশের স্বরে বলিলেন, তোর ত বিয়ে হয়ে গেছে খোকা। তুই তাকে অস্বীকার কর্‌তে পারিস্, কিন্তু সে মেয়েকে না দেখলেও তোর কাছে তার সম্বন্ধে যা শুনেছি—তাতে মনে হচ্ছে—সে তোকে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না। তুই যদি তাকে না নিস্, সে তার নিয়তিকে মেনে নিয়ে চিরকাল দুঃখ-

ভোগ কর্‌বে। জানিনা, তার অদৃষ্টে কি আছে, কিন্তু আমার ছেলে যদি তার কাছে চির-অপরাধীই থেকে যায়—আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে!

জাহাঙ্গীর শূন্য দৃষ্টিতে একবার তাহার মাতার পানে চাহিয়া অসহায় ভাবে শুইয়া পড়িল।

মা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু তোর এত ভয় কেন খোকা? সে কি সুন্দরী নয়? না অন্য কারণে তোর মনে ধরেনি?

জাহাঙ্গীর রুগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না মা, তা নয়। তার মত সুন্দরী মেয়ে খুব কমই চোখে পড়ে। তুমি ত হারুণকে দেখেছ। তার চেয়েও সে সুন্দর। আর, মনে ধরার কথাই উঠ্‌তে পারে না, কেননা সে মনই আমার নেই। আমায় বিয়ে কর্‌তে নেই—তাই বল্‌ছিলুম।

মাতা স্থির দৃষ্টিতে পুত্রের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, বিয়ে কর্‌তে নেই মানে? তুই কি ফকির দরবেশের ব্রত নিয়েছিস্?

জাহাঙ্গীর অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, কতকটা তাই!

মাতার দুই চোখ অশ্রুতে পুরিয়া উঠিল। তবে কি পুত্র তাহার জন্ম-কাহিনীর বেদনা আজও ভুলিতে পারে নাই? আজও কি সে তার জন্মের জন্য অনুতপ্ত?

মোতিয়া আসিয়া খবর দিল, দেওয়ান সাহেব আসিয়াছেন। মাতা মোতিয়াকে বলিলেন, তুই তোর ভাইজানের কাছে থাক, দেওয়ান সাহেবের সাথে আমার কথা আছে। বলিয়া পাশের কামরায় উঠিয়া গেলেন।

মোতিয়া জাহাঙ্গীরের পানে পৌনে দুই চোখে তাকাইয়া মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, ভাইজান, পা টিপ্যা দিবাম্ নি?

জাহাঙ্গীর কোনো উত্তর দিল না। হয়ত সে তাহার কথা শুনিতেই পায় নাই।

মোতিয়া জাহাঙ্গীরের পা কোলে তুলিয়া লইয়া টিপিতে লাগিল। জাহাঙ্গীর আপত্তি করিল না।

তাহার মনে তখন ঝড় বহিতেছিল। তাহার মনে পড়িল, ভূণীর চিঠির কথা। পরদিন অর্থের লোভে গরুর গাড়ীর সেই গাড়োয়ান সত্য-সত্যই শিউড়ি ষ্টেশনে পত্রের উত্তর লইয়া আসিয়াছিল।

ভূণী লিখিয়াছিল:—যদি মা আমাকে আপনার হাতে সঁপিয়া না দিতেন, আমি আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া অপমানজনক মনে করিতাম। আপনি যাহাকে চিরজীবনের নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ তাহার প্রতি এই করুণার হেতু কি, জানিনা। আমি আপনাকে যতটুকু বুঝিয়াছি—তাহাতে আমার ধারণা—হৃদয় ছাড়া আপনার সকল কিছুই আছে। কিন্তু সে সকল লইয়া ত—নারী আমি—আমার কোনো লাভ নাই। দুঃখের সমুদ্রে কলার ভেলায় আমরা ভাসিতেছিলাম। হঠাৎ আপনার বিপুল অর্ণব-পোত আমাদের কাছে আসিল। উদ্ধার পাইবার আশা করি নাই, বরং মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল—তাহাই ফলিয়া গেল। আপনার জাহাজের ঢেউ লাগিয়া আমাদের কলার ভেলাখানি ডুবিয়া গেল। এখন তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য পথ নাই। যতদিন শক্তি থাকিবে যুদ্ধ করিব।

আপনি কূলে উঠিয়াছেন। যাহারা তরঙ্গে ডুবিতেছে—তাহাদের লইয়া এ বিদ্রূপ কেন?

ইচ্ছা করিলেই কি আপনার কূলে উঠিতে পারি? আপনি কি ভাবিয়া আমায় ডাকিয়াছেন, জানি না।

যে অধিকার আমার মা আপনায় দিয়াছেন—সেই অধিকারের দাবী লইয়া যেদিন শুধু আপনি নয়—আপনার অভিভাবিকা জননী আসিয়া ডাকিবেন—সেই দিন হয়ত যাইতে পারি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নয়। লোক-সমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়া আপনার কাছে গেলে—আপনিই আমায় শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন না। অন্তরে যাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, বাহিরে দিনের আলোকে তাহাকে স্বীকার করিবার সৌভাগ্য যদি অর্জ্জন করি, সেদিন আপনার আদেশে আমি মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়া দাঁড়াইতে পারিব।

আশা করি, আপনি আমায় ভুল বুঝিবেন না। এবং আর এরূপ ছেলেমানুষীও করিবেন না। আমার আত্মসম্মান আপনার আত্মসম্মানের চেয়ে কোনো অংশে হীন বা ন্যূন নহে।

বাহিরের ঐশ্বর্য্যের দম্ভ আমার নাই, আমরা দরিদ্র; কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্য্যের গৌরব আমার অন্ততঃ আপনার অপেক্ষা কম নাই।

আমাদের মাঝে যে অকূল পারাবার বহিয়া চলিয়াছে—তাহাই হয়ত আমার নিয়তি। এ কূলে আপনি আসিয়াছিলেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মানিব। ওকূল হইতে আর হাত ছানি দিয়া ডাকিবেন না। মানুষেরই ত মন, একবার যদি ঝাঁপাইয়া পড়ি প্রলোভনের বশে, একূল ওকূল দুই কূল হারাইব।

মা আপনার জন্য এখনো কাঁদেন। বলেন, "মীনা এসে চ'লে গেল! ও আর আসবে না!" যদি উপযুক্ত চীকিৎসা হইত, মা হয়ত ভাল হইলেও হইতে পারিতেন।

এইবার বাবার আর দাদার পাগল হইতে বাকী, আপনার অনুগ্রহে হয়ত তাহারও আর বিলম্ব নাই।

আপনি কি যাদু জানেন ? মোমি আর মোবারক আজও আপনার ওকালতি করে ! দুটো কাপড় আর দু' হাঁড়ি সন্দেশের এমনই মোহ ! চির-দুঃখী কিনা !

আমাকে ভুলিয়াও যে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনায় অশেষ ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ দিব, যদি স্মরণ করিয়া ভুলিয়া যান এবং এইরূপ অসম্মানজনক পত্রাদি প্রেরণ না করেন ! ইতি—

আপনার দয়া-ঋণী

তহ্‌মিনা।

জাহাঙ্গীর সুখ ও দুঃখের নানা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

জাগিয়া দেখিল, তাহার মাতা শিয়রে বসিয়া অতন্দ্র নয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছেন।

সে চোখ মেলিতেই মা বলিয়া উঠিলেন, জেগে উঠ্‌লি খোকা ? ঘুমো আরো খানিক !

জাহাঙ্গীর উঠিয়া বসিয়া বলিল, না মা, আর ঘুম হবেনা। বলিয়াই উস্‌খুস্ করিতে লাগিল।

মা হাসিয়া বলিলেন, তুই কি ভাবছিস্ বল্ ত ! আমি কালই হারুণের বাড়ী যা'ব। দেওয়ান সাহবেও যাবেন, তোকেও যেতে হবে।

জাহাঙ্গীর কোনরূপে শুধু বলিতে পারিল...মা !

মা বলিলেন, হাঁ, এ তোর মায়ের আদেশ। বলিয়াই একটু থামিয়া বলিলেন, তোর পাঞ্জাবীটা ধুতে দিতে গিয়ে তার পকেটে বৌমার লেখা চিঠি দেখেছি। এমন মেয়ে পেয়েও যদি তুই মাথায় তু'লে না নিস্,

বুঝ্‌ব তোর কপালে বড় দুঃখ আছে। তুই না নিস্, আমি আমার ঘরের লক্ষ্মীকে মাথায় ক'রে নিয়ে আস্‌ব। আমি হজ কর্‌তে যাব বলে বেরিয়েছিলুম—খোদা আমার হজের পুণ্য রাস্তাতেই দিয়েছেন। তাকে না নিতে পার্‌লে খোদা নারাজ হবেন!

জাহাঙ্গীর ফাঁসির আসামীর মত দয়া ভিক্ষার স্বরে বলিয়া উঠিল, দোহাই মা, আমায় এত বড় শাস্তি দিওনা। এ শাস্তির অংশ তাকেও নিতে হবে তাহ'লে। তাছাড়া সে যা মেয়ে—তুমি গেলেও সে আস্‌বেনা—যদি না আমি তাকে সত্যিকার বিয়ে করি।

মা হাসিয়া বলিলেন, তোর বিয়েকে এত ভয় কেন খোকা, বল্ ত! তোকে ত কেউ ফাঁসি দিচ্ছেনা!—বলিয়া জিভ্ কাটিয়া "ষাট্ ষাট্ বালাই" বলিয়া পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন. কি সব বদ্‌কায়েলী কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় মা গো!—যাক্, এখন যদি তুই রাজী না-ই হস্—তার ব্যবস্থাও দেওয়ানজী ক'রে রেখেছেন। হারুণকে আমার ষ্টেটে এখন শ' তিনেক টাকার একটা চাকরি দিয়ে ওদের সপরিবারে কলকাতা নিয়ে আস্‌ব। চব্বিশ পরগনায় রায়েদের একটা বড় জমিদারী বিক্রি হচ্ছে—সেটা কিনে নেবার ব্যবস্থা করেছি। হারুণ সেই ষ্টেটের ম্যানেজার হবে। তারপর যা' কর্‌বার্, করা যাবে।

জাহাঙ্গীর এক মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি মা, তুমি হারুণকে নিয়ে আস্‌বে? আহা, বেচারার বড় দুঃখ মা! এইবার বি, এ, দেবে, কিন্তু পাস কর্‌লেও সে চাকরি পেত কোথায়? অথচ ওর চাকরি না হ'লে ওরা সব ক'টি প্রাণী উপোস ক'রে মর্‌বে! ওকে যদি চাকরি দিয়ে আন্‌তে পার—তাহ'লে আমার কৃতকর্ম্মের অনেকটা অনুশোচনা কমে।

মা হাসিয়া বল্‌লেন, তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় বল্।—মা মনে মনে ভাবিলেন, ছেলে শুধু হারুণের চাকুরির জন্যই খুসী হইয়া উঠে নাই, তাহার সাথে মেয়েটাও যে আসিবে, ইহাও তাহার খুসী হইয়া উঠার অন্যতম কারণ। তাঁহার মনের মেঘ অনেকটা কাটিয়া গেল। ছেলে বেলা হইতেই তাঁহার খোকা বিবাহ ব্যাপারে অতিরিক্ত লজ্জা অনুভব করে। ওরূপ খেয়াল অনেক ছেলেরই থাকে এবং তাহা কাটিয়া যাইতেও দেরী হয় না। তাঁহার খোকাও হয় ত মনে মনে রাজী আছে, শুধু লজ্জার খাতিরে এতটা করিতেছে। তাই অত্যন্ত প্রসন্ন মনে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, বেশী রাত্রি হয়নি এখনো। এখনি আমার সব দরকারী জিনিস পত্র কিনে ফেল্‌তে হবে। তুইও আমার সাথে চল্। দেওয়ানজী গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা কর্‌ছেন বাইরের ঘরে।

জাহাঙ্গীর উঠিতে উঠিতে বলিল, কিন্তু আমাকে আর যেতে হবেনা ত সাথে ?

মা বল্‌লেন, সে কা'ল সকালে বোঝা যাবে। সকালেই ট্রেণ, আমি টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি হারুণের ওখানে। হারুণ শিউড়ি ষ্টেশনে থাক্‌বে। তুই মুখ হাত ধূয়ে কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হয়ে নে, আমি আস্‌ছি! জাহাঙ্গীর মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া চা খাইতে খাইতে নানান্ আকাশ-কুসুমের কল্পনা করিতে লাগিল। তাহার আর সেখানে যাওয়া উচিত কি না। অথচ সে না গেলে যদি তাহারা আসিতে অসম্মত হয়। সত্যই তাহার পাপের যদি কিছুমাত্রও প্রায়শ্চিত্ত হয় হারুণকে দারিদ্র্যের কবল হইতে রক্ষা করিয়া, তাহা হইলেও তাহার যাওয়াই উচিত। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া যদি আবার ভূণীর অভিমান উথলিয়া উঠে! হারুণই যদি এই অনুগ্রহ লইতে অসম্মত হয়! তাহার পিতা যদি

পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া আসিতে না চান। কিন্তু এ সকলের উর্দ্ধে সে তাহার বুদ্ধিমতী মাতার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের ও দেওয়ান সাহেবের বৈষয়িক বুদ্ধির উপর বেশী ভর্‌সা রাখে। তাঁহারা ইহার একটা কিনারা করিয়া উঠিতে পারিবেন নিশ্চয়। কিন্তু তবু ঐ দলিতা নাগিণীর মত তহ্‌মিনা? সে যদি ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়! হঠাৎ জাহাঙ্গীরের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। না, তাহার কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না। মাতা যাইতেছেন, যান, সে অবমানিত হইতে কিছুতেই সেখানে যাইবে না!

মাতা আসিয়া বলিলেন, খোকা ওঠ. রাত্রি সাড়ে আটটা বেজে গেল। দোকান পাট বন্ধ হয়ে যাবে আবার।

জাহাঙ্গীর সুবোধ বালকের মত মাতার সহিত গিয়া গাড়ীতে বসিল। দেওয়ানজী অন্য গাড়ীতে উঠিলেন।

মাতার বাজার করিবার ঘটা দেখিয়া জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, মা তুমি যে জুয়েলারীর আর কাপড়ের দোকান উজাড় ক'রে নিয়ে যাবে দেখ্‌ছি!

মা হেসে বল্‌লেন, এতদিন পরে মেয়ে পেলুম, তাকে দেবার মতন গয়না কাপড় কি তবু পাওয়া গেল! তুই ওকে যা দুঃখ দিয়েছিস্, এত গয়না কাপড় দিয়েও ত তা ঢাক্‌তে পার্‌ব না খোকা!

জাহাঙ্গীর আর কোনো কথা বলিতে সাহস করিল না।

দেওয়ান সাহেবের ভ্রূকুটী কুটীল মুখেও খুসী যেন আর ধরে না। ফর্‌রোখ সাহেব শুধু তাঁহার প্রভু ছিলেন না, তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুও ছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে এবং আজও দেওয়ান সাহেব কোনো দিন ভাবিবার অবকাশ পান নাই, যে তিনি বেতন ভোগী ভৃত্য। পরম বিশ্বাসে তাঁহার হাতে জমিদারীর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ফর্‌রোখ

সাহেব আনন্দ করিয়া কাটাইয়াছেন। জাহাঙ্গীরের মাতাও তেমনি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে দেওয়ান সাহেবকে সম্মান করিয়া আসিতেছেন। দেওয়ান সাহেবের দুইটী পুত্র। দুইটী পুত্রই বিলাতে গিয়াছে। বন্ধুজ ও প্রভুপুত্র জাহাঙ্গীরকে পুত্রাধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন বলিয়াই তাহার ভাবী সুখের সম্ভাবনায় এতটা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন।

এত বড় বিষয়ী ও মিতব্যয়ী দেওয়ান সাহেবও সেদিন যেন অতি বড় অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিলেন। জাহাঙ্গীর ইহা লইয়া একবার বলিয়া ফেলিল, আজ দেওয়ান সাহেবের আঙ্‌ুলগুলো অতিরিক্ত ফাঁক হয়ে গেছে! যে আঙ্‌ুল দিয়ে কখনো জল গলেনি, সেই আঙ্‌ুলের ফাঁক দিয়ে আজ হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে!

দেওয়ানজী শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু এ টাকা ত জলে পড়ছেনা বাবাজি! যার টাকা তাকেই দিচ্ছি। এই জমিদারীই দু'দিন পরে যার কাছে বি'কিয়ে দিতে যাচ্ছি, এই দু' দশ হাজার টাকা নজরানা ও তার কাছে কিছুই নয়। তুমি ত জমিদারী দেখলে না বাবা, এইবার যে দেখ্‌বে— তাকে এ কয় টাকার জিনিস আর দিলুম?

জাহাঙ্গীরের মাতা অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন, তুই কি বল্‌ছিস খোকা, তোর বাবা মর্‌বার সময় যে ঐ দেওয়ানজীর হাতেই তোকে দিয়ে গেছিলেন! আজ তোর আনন্দের দিনে উনি কি হিসেব ক'রে আনন্দ কর্‌বেন?

পরদিন সকালে হাবড়া প্ল্যাটফর্মে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল রাশি রাশি জিনিসপত্র, একটা স্যালুনের সামনে। দেওয়ানজী প্ল্যাট্‌ফর্মে ছুটাছুটি করিয়া চেঁচাইয়া হৈ চৈ বাধাইয়া তুলিলেন।

জাহাঙ্গীর কলের পুতুলের মত দেওয়ান সাহেব ও তাহার মাতার আদেশ পালন করিয়া যাইতে লাগিল। ষ্টেশনে হঠাৎ একজন মৌলবী সাহেব চলিয়া যাইতে যাইতে যেন জাহাঙ্গীরকে ছড়ির মৃদু আঘাত করিয়া গেল। জাহাঙ্গীর ফিরিয়া দেখিবা মাত্র মৌলবী সাহেব ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিলেন। কাছে যাইতেই মৌলবী সাহেব বলিলেন, আমি সব জানি। শিউড়িতে নেমে আমায় দেখা করিস্। আমিও সেইখানেই নাম্‌ব।

জাহাঙ্গীর হাসিয়া নমস্কার করিতে গিয়া সামলাইয়া লইয়া আদাব করিয়া চলিয়া আসিল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কে খোকা? জাহাঙ্গীর বলিল, উনি আমাদের কলেজের আর্‌বীর প্রফেসর। উনিও শিউড়ি যাচ্ছেন, তাই আমায় শিউড়িতে নেমে দেখা কর্‌তে বল্‌লেন!

মাতা আর প্রশ্ন করিলেন না। জাহাঙ্গীর তাহার প্রমত্-দা'র এই হঠাৎ আবির্ভাবে একটু চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। সে হঠাৎ এই ভাবিয়া খুসী হইয়া উঠিল, যে সুখের স্বর্গ সে রচনা করিতে চলিয়াছে—এইবার তাহা হয়ত তাহার অদৃশ্য ভাগ্য-দেবতার রুদ্র আশীর্ব্বাদে আগুনে পুড়িয়া যাইবে।

মাতা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, খোকা, তোর মৌলবী সাহেবকে আমাদের স্যালুনেই ডেকে নে না। দেওয়ান সাহেবের কামরায় তিনি থাক্‌বেন। যা, ডেকে এনে খেতে টেতে দে!

জাহাঙ্গীর প্রমাদ গণিল। তাহার মনে হইল মাতা বোধ হয় সন্দেহ করিয়াছেন।

সে বলিল, আর ত ট্রেণ ছাড়্‌বার সময় নেই মা। ওঁকে বরং বর্দ্ধমান ষ্টেশনে ডেকে নেব আমাদের গাড়ীতে।

মাতা বলিলেন, না, না, যথেষ্ট সময় আছে। এখনো আধ ঘণ্টা দেরী। ভদ্রলোকের হয়ত কত কষ্ট হবে—ইণ্টার কি সেকেণ্ড্ ক্লাসে যেতে। তোর মাষ্টার কী মনে করবেন বল্ ত! তা' ছাড়া ওঁকে দিয়ে আমার কাজ আছে!

জাহাঙ্গীর একেবারে ভয় খাইয়া গেল। পাছে মাতার সন্দেহ আরো বাড়ে, তাই সে দ্বিরুক্তি না করিয়া মৌলবী সাহেবকে খুঁজিতে নামিয়া গেল।

জাহাঙ্গীর অহেতুক ভয়চিত্ত। তাহার তথাকথিত মৌলবী সাহেবকে বলিতেই তিনি সানন্দে দেওয়ান সাহেবের গাড়ীতে আসিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বিনা ওজরে খাদ্যাদির সৎকার করিলেন।

জাহাঙ্গীরের মাতা অত্যন্ত সুখী হইয়া বলিলেন, দেখ্ দেখি, আমি না বল্‌লে বেচারা মৌলবী মানুষ ঐ ইণ্টার ক্লাসের ভিড়ে আধমরা হয়ে যেতেন।

দেওয়ান সাহেব মৌলবী সাহেবের সাথে জাহাঙ্গীরের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর দেখিল, তাহার প্রমত্-দা' নকল-মৌলবী হইলেও আসল মৌলবীর চেয়েও দুরস্ত-জবান। চমৎকার উর্দ্দু ফার্সির আমেজ দিয়া তিনি কথা বলিতেছেন।

পাশের কামরা হইতে জাহাঙ্গীরের মাতা বাঁদি দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, মৌলবীসাহেবকেও তাহাদের এই খুশীতে শরীফ হইতে হইবে। অর্থাৎ তাহাদের সাথে তাঁহাকেও যাইতে হইবে।

মৌলবী সাহেব বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি অবশ্যই হুজুর আম্মার এ হুকুম পালন করিতেন যদি না শিউড়িতে তাঁহার রোগ-শায়িতা বহিনকে দেখিতে না যাইতেন!

মৌলবী সাহেব জাহাঙ্গীরকে এক সময় একলা পাইয়া চুপি চুপি বলিলেন, তোদের স্যালুনে জায়গা পেয়ে আমার ভালই হ'ল, শালার টিক্‌টিকি আর পিছু নিতে পার্‌বে না !

জাহাঙ্গীর প্রশ্ন করিল, কিন্তু প্রমত্-দা', আমার কি হবে ? আমাকে যে যূপকাষ্ঠে নিয়ে যাচ্ছে !

মৌলবী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, খোদার মর্জ্জি বাচ্চা ! সব মেঘ কেটে যাবে। মাকে অসন্তুষ্ট ক'রো না, খোদার রহম্ আপ্‌নি তোমার ওপর নাজেল্ হবে !

জাহাঙ্গীর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, সোবহান আল্লাহ্ মৌলবী সাহেব ! ক্যা তরিকা বাতায়া আপ নে !

মৌলবী সাহেব এধার ওধার দেখিয়া লইয়া বলিলেন, তোকে পিনাকীর মাসিমা ডেকেছেন, তা' ছাড়া আমারও কাজ আছে। তুই হারুণের বাড়ীর ফের্‌তা ওখান হয়ে যাবি।

জাহাঙ্গীর বলিল, কিন্তু মা যে সাথে আছেন !

মৌলবী সাহেব বলিলেন, তার ব্যবস্থা করা যাবে'খন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। জাহাঙ্গীরের বুক অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

১৫

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে নামিয়া জাহাঙ্গীর মৌলবী সাহেবকে লইয়া "রিফ্রেশ্-মেণ্ট্ রুমে" ঢুকিয়া পড়িল।

সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা দুইজন ছাড়া আর কেহ সেখানে ছিল না।

মৌলবী সাহেব বলিলেন, মামারা এখনো মুসলমানকে সন্দেহের চক্ষে দেখে না, তাই আজো দিনের আলোকে কোনো রকমে মৌলবী সায়েব সেজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সে কথা যাক্, তোর ওপর আবার ভীষণ কাজের ভার পড়্বে, পার্বি ?

জাহাঙ্গীর বলিল, এর মধ্যে ত পারা না পারার কথা নেই। যা আদেশ কর্বেন, তা আমায় পালন কর্তেই হবে।

মৌলবী সাহেব খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, জিতা রহো লড়্কা! তোকে আবার মালপত্র সরিয়ে নিয়ে আস্তে হবে। তুই ছাড়া এ কাজ আর কারুর দ্বারাই হবার নয়।

জাহাঙ্গীর বলিল, সেবার কিন্তু মর্তে মর্তে বেঁচে গেছি দাদা! আব্কারী-সাব-ইন্স্পেক্টর যখন গাড়ীতে উ'ঠে বাক্স-প্যাট্রা খুল্তে আরম্ভ কর্লে, তখন আমার আত্মারাম ত খাঁচা ছাড়া হ'বার যো হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে একজনের প্যাঁট্রা থেকে সের কতক আফিম বেরোতেই সে তাকে পাকড়াও ক'রে নেমে গেল। একে একে সব বাক্স যদি খুঁজ্ত, কি হ'ত তা হ'লে—ভাব্তেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! বলিয়াই সাম্লাইয়া লইল, ভাবনা আমার নিজের জন্য ছিল না—ভাবনা

ছিল জিনিসপত্রগুলো নিয়ে। সে ব্যাটাও মর্‌ত—হয়ত বা আমিও মর্‌তুম—মাঝে অত দামী জিনিসগুলো বেহাত হয়ে যেত!

মৌলবী সাহেব বলিলেন, যাক্ এবার তোদের স্যালুনেই ওগুলো নিয়ে যেতে পারবি ফিরে যাবার সময়। কারুর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাক্‌বে না।

জাহাঙ্গীর হঠাৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু এবার যে আমার বোধ হয় জোড়ে ফির্‌তে হবে দাদা!

মৌলবী সাহেব বলিলেন, দেখ্—নিয়তিকে এড়াতে পার্‌বিনে। আমাদের বজ্রপানিও ত বিবাহিত। শুধু বিবাহিতই নন, ছেলে-পিলে ঘর-সংসার আছে। আসল কথা, তোর যদি সত্যকার দেশপ্রেম থাকে—কোনো ব্যাটাই তোর সাম্‌নে দাঁড়াতে পার্‌বে না।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িতেই তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উঠিতেই দরজার সাম্‌নে এক চির-পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া জাহাঙ্গীর থতমত খাইয়া গেল। এ যে সেই ধাড়ি টিক্‌টিকি অক্ষয় বাবু! জাহাঙ্গীরের অবস্থা বুঝিয়াই যেন মৌলবী সাহেব কাংস্যকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আরে বেহোশ্! আভি টারিন্ ছোড় দেগা! দৌড়কে চল্!

অক্ষয় বাবু বাজ পাখীর মত চোখে তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন।

জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া অক্ষয় বাবুও পাশের গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

জাহাঙ্গীর ইঙ্গিত করিতেই মৌলবী সাহেব বলিয়া উঠিলেন, কুছ ফিকির নেই বাচ্চা, উয়ো হজম হো জায়েগা!

দেওয়ান সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আর একটু দেরী হ'লেই ষ্টেশনে ব'সে ব'সে হজম কর্‌তে হত মৌলবী সাহেব। আর আপনারা নাম্‌বেন না কোথাও। গাড়ীতেই খাবার আনিয়ে নেবেন।

অণ্ডাল ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিবার সময় জাহাঙ্গীর দেখিল, অক্ষয় বাবু তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। সে সেদিকে আর বেশী দৃষ্টিপাত না করিয়া একটা বই লইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের গাড়ী হইতে নামিবার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইল না। তাহাদের স্যালুন ইঞ্জিন আসিয়া টানিয়া শিউড়ির গাড়ীর ন্যাজে জুড়িয়া দিল।

মৌলবী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চল্‌বে না" গানটা জান?

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, গানটা জানি, কিন্তু গাইতে জানি না। আর জান্‌লেও গাইতাম না।

পাশের কামরা হইতে মা বলিয়া উঠিলেন, খোকা বুঝি গান টান একেবারে ভু'লে গেছিস্?

জাহাঙ্গীর বলিল, হাঁ মা, ওসব ভু'লে যাওয়াই ভাল। অনর্থক কতকগুলো লোকের শান্তিভঙ্গ ক'রে লাভ কি?

মা হাসিয়া বলিলেন, গানে বুঝি শান্তিভঙ্গ হয়? তুই একেবারে ভূত হ'য়ে গেছিস্ খোকা! দুনিয়ায় কি তোর সব আশা আকাঙ্ক্ষা মিটে গেছে এরি মধ্যে?

জাহাঙ্গীর হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বেটী ভয়ানক চালাক! পাশের জান্‌লায় ব'সে শুন্‌ছেন আমরা কি কথা বলা কওয়া করি!

সন্ধ্যায় ট্রেণ শিউড়ি আসিয়া পঁহুছিল।

হারুণ ছুটিয়া আসিয়া জাহাঙ্গীরের মাতার ও দেওয়ান সাহেবের পায়ের ধূলা লইল।

মাতা তাহাকে জাহাঙ্গীরের মতই বুকে ধরিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন।

দেওয়ান সাহেব এক ডজন কুলি লইয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, খোকা, তোর মৌলবী সাহেব কোথায় গেলেন ?

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, উনি এতক্ষণ বোধ হয় তাঁর বোনের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছেন মা !

মাতা বলিলেন, সে কি ! তুই ওঁর বোনের বাসা চিনিস্ ? সেখান থেকে তাঁকে যে আন্‌তেই হবে !

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, সে ত আমি চিনি না মা। তাছাড়া ওঁর বোনের অসুখ, এখন ত যেতেও পার্‌তেন না।

হারুণ জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ মৌলবী সাহেব ?

জাহাঙ্গীর বলিল, প্রফেসার আজেহার সাহেব।

হারুণ বলিল, কই, তাঁকে ত দেখ্‌লুম না।

জাহাঙ্গীর বলিল, তোমরা যতক্ষণ বোঁচ্‌কা পুঁটুলি সাম্‌লাচ্ছিলে, ততক্ষণ উনি পগার পার হয়ে গেছেন।

জাহাঙ্গীর দেখিল, অক্ষয় বাবু সারা প্লাট্‌ফর্ম্ম মন্থন করিয়া ফিরিতেছেন ! সে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া মনে মনে বলিল, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি !

তবু তাহার মনে কেমন একটা অজানা ভয় উঁকি দিয়া ফিরিতে লাগিল।

গোটা চার পাল্‌কি ও দুইখানা গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া জিনিসপত্র সমেত সদলবলে জাহাঙ্গীর হারুণের গ্রামে যাত্রা করিল।

টর্চ্চ লাইট ও বন্দুক সাথে ছিল। তাহা ছাড়াও চারি পাল্‌কির বেহারা, গাড়োয়ান, ভোজপুরী বরকন্দাজ প্রভৃতির জন্য কেহ আর রাত্রে যাইতে আপত্তি করিল না। আকাশও বেশ পরিষ্কার ছিল, ঝড় বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। নিদাঘের সুনির্ম্মল আকাশে শুক্লা নবমীর চাঁদ ঝলমল করিতেছিল।

পাল্কীতে উঠিয়া জাহাঙ্গীরের মাতা বলিলেন, বাবা! এ রকম বাক্সবন্দী হয়ে যাওয়া ত অভ্যাস নেই। একে এই গরম, তার ওপর এই রকম ঘাড়মুড় ভেঙে ব'সে থাকা। আমি তাই বল্‌ছিলাম মোটরটা সাথে আন্‌তে।

হারুণ হাসিয়া বলিল, মোটর না এনে ভালই করেছেন মা। এদেশে মোটর যাবার রাস্তা নেই। তার ওপর মাঝে নদী।

বিচিত্র শব্দ করিতে করিতে পাল্কী-বাহকগণ অগ্রে অগ্রে চলিল। পশ্চাতে গরুর গাড়ী, সকলের শেষে বন্দুক-স্কন্ধে বরকন্দাজ।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় সকলে হারুণদের গ্রামে গিয়া পঁহুছিলেন। পল্লীগ্রামে রাত্রি এগারটার সময় কেহ সজাগ ছিল না। বেগম দেখিতে হয়ত গ্রামের লোক ভাঙিয়া পড়িত। হারুণ তাহার পিতা ও বোনদের ছাড়া কাহাকেও এ খবর বলে নাই, কাজেই গ্রামেও এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে পারে নাই। মোবারক তাহার এক বন্ধুকে এই খবর বলায় সে বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, উপরন্তু

তাহার মাথায় জোর এক চাঁটি মারিয়া বলিয়াছিল যে, তাহারও পাগল হইবার আর দেরী নাই। ইহার পর সে আর কাহাকেও এ খোস-খবর দিতে সাহস করে নাই।

এত পাল্কী এত লোকজন দেখিয়া মোবারক ভ্যাবাচাকা খাইয়া প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল, তাহার আক্কেল গুড়ুম্ হইয়া গিয়াছে। তাহার অন্ধ পিতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে গিয়া দুইবার আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। হারুণ তাহার পিতাকে স্থির হইতে বলিয়া জাহাঙ্গীরের মাতাকে সসম্মানে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। দেওয়ান সাহেব বাহির বাড়ীতে গিয়া বসিলেন।

জাহাঙ্গীর সাম্নের খোলা মাঠে বসিয়া হাওয়া খাইয়া বাঁচিল।

তহমিনা ও মোমি আসিয়া জাহাঙ্গীরের মাতার কদম্‌বুসি করিল। মাতা দুই বোনকে বক্ষে চপিয়া ধরিয়া ললাট চুম্বন করিলেন।

বাঁদিদের হাতে টর্চ্চ-লাইট্ ছিল, তাহারি আলোকে মাতা অনিমেষ নেত্রে তাঁহার ভাবী বধূর মুখ দেখিতে লাগিলেন। হাঁ, তাঁহার পুত্রবধূ হবার মত রূপসী বটে!

মাতা বারে বারে তহমিনার ললাট চিবুক ও শিরশ্চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যধিক আদরে, কিম্বা কেন জানিনা, তহমিনা তাঁহার বুকে মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মা অঙিনাতেই দাঁড়াইয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কেঁদোনা মা আমার, সোনা আমার! আর ভয় কি! ও পাগল তোমার অসম্মান করেছে—আমি তোমাকে বুকে তুলে নিতে এসেছি!

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া তহমিনা শান্ত হইল। ভাগ্যক্রমে তাহার উন্মাদিনী মাতা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন, নৈলে তিনি হয়ত তাঁহার মীনার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিতেন।

বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া জাহাঙ্গীরের মাতার বুঝিতে বাকী রহিল না—দুরবস্থার শেষতম স্তরে ইহারা আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। এমন সোনার চাঁদ মেয়েও এমন ঘরে থাকে!

তহমিনা সকলের জন্য রাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সকলে তাহা খাইয়া তাহার রান্নার অশেষ তারিফ করিতে লাগিলেন।

হারুণের পিতা কেবলি বলিতে লাগিলেন, এ গরীবের বাড়ী হাতীর পা পড়িবে—ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহাদিগকে বসিতে দিবার মত তাঁহার স্থান ত নাই। তাঁহার বিনয় ও অশোয়াস্তি দেখিয়া দেওয়ান সাহেব এবং বেগম সাহেবা ঘনিষ্ঠ আলাপ আপ্যায়নে তাঁহাকে আপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হারুণের পিতা আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

জাহাঙ্গীরের মাতা নিজে তহমিনা, মোমি ও মোবারককে খাওয়াইলেন। অত্যধিক গরম পড়ায় তাঁহার সাথের দুইখানা ক্যাম্পখাট খুলিয়া উঠানেই শুইয়া পড়িলেন। তহমিনাকে পাশের খাটে শোয়াইয়া আদর করিতে করিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাহার মনের কথা বাহির করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তহমিনা জীবনে এত স্নেহ পায় নাই। সে এই আদরে গলিয়া গিয়া ছোট খুকীটির মত তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া দুই একটী কথায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

দেওয়ান সাহেব হারুণের পিতার মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সে রাত্রে আর বেশী কথা হইল না। পথশ্রান্তিতে সকলেই শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

তহমিনার চক্ষে ঘুম ছিল না। সে যখন দেখিল, সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, অথচ তাহার ঘুম আসিতেছে না, তখন সে উঠিয়া উন্মাদিনী মাতার খোঁজ লইতে গেল। উঠান হইতে অন্দরে যাইবার পথেই সদর দরজা। সে দেখিল, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে। দরজা বন্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ তাহার সাম্‌নের মাঠের উপরে দৃষ্টি পড়িল। সে দেখিল, অস্তমান চন্দ্রের ম্লান চন্দ্রালোকে বসিয়া জাহাঙ্গীর আকাশের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। সে আর চোখ ফিরাইতে পারিল না, নির্ণিমেষ নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

কেন সে অতন্দ্রনয়নে একা জাগিয়া শূন্য আকাশে চাহিয়া আছে? এই সুন্দর পৃথিবীতে কি তাহার চাহিবার কিছুই নাই? এত ঐশ্বর্য্য, এমন মা যাহার, তাহার কেন এই দুঃখ-বিলাস?

তহমিনা বুঝিতে পারিয়াছিল, কেন হঠাৎ জাহাঙ্গীরের মাতা সদলবলে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাহার আরো মনে হইতে লাগিল, হয়ত জাহাঙ্গীরই তাহার মাতাকে লইয়া আসিয়াছে। ভাবিতেই তাহার মন অনভূতপূর্ব্ব আনন্দে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিল। তাহা হইলে, যতটা হৃদয়হীন সে জাহাঙ্গীরকে মনে করিয়াছিল, ততটা হৃদয়হীন সে নয়।

কিন্তু কি রকম বদরসিক লোকটা? একবারও কি ভুলিয়া খোলা দরজার দিকে তাকাইতে নাই?

সে যেন দরজা বন্ধ করিবার জন্যই দুই কবাটে আঘাত করিল এবং যুগল কবাটের স্বল্প অবকাশ দিয়া দেখিতে লাগিল, জাহাঙ্গীরের ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে কিনা।

জাহাঙ্গীর দরজার দিকে তাকাইল এবং একজন দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ইহাও বুঝিতে পারিল। সে মনে করিল, কোনো প্রয়োজনে হয়ত তাহার মাতা তাহাকে ডাকিতেছেন। সে দরজা ঠেলিতেই তহমিনাকে দেখিয়া চমকিয়া প্রশ্ন করিল, কে? ভূণী? আমায় ডাক্‌ছিলে?

ভূণী ওর্ফে তহমিনা লজ্জায় মরিয়া গিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, ছি ছি, একি বেহায়াপনা সে করিল!

জাহাঙ্গীর আবার প্রশ্ন করিল, আমাকে কি কোনো কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বে?

ভূণী হঠাৎ যেন কূল পাইল। সে অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের জোরে সহজ হইবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল, আবার এলেন কেন জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি?

জাহাঙ্গীর আহত হইয়া তাহার চোখে চোখ রাখিয়া বলিল, আমি ত আসিনি, মা এসেছেন তোমায় নিয়ে যেতে!

তহমিনা জিজ্ঞাসা করিল, মা তা হ'লে সব শুনেছেন?

জাহাঙ্গীর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, শুনেছেন নয়—জেনেছেন তোমার চিঠি প'ড়ে!

তহমিনা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, মাগো, কি হবে! ছি ছি! তুমি চিঠি দেখালে কেন?

জাহাঙ্গীর এইবার একটু জোরেই হাসিয়া ফেলিল।

তহমিনা উত্তেজনায় জাহাঙ্গীরের মুখের কাছে হাত আনিয়া সহসা থামিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, দোহাই! অত জোরে হেসোনা, কেউ জেগে উঠ্‌বে!

জাহাঙ্গীরেরও মনে নেশা ধরিয়াছিল। সে আয়তচক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাবে ত?

তহমিনা লজ্জাজড়িতকণ্ঠে বলিল, সেত আপনিই জানেন!

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, বাঃ রে! বেশ ত! একবার 'আপনি', একবার 'তুমি'! একবার 'হিঁয়া আও'—একবার 'ভাগো'!

জাহাঙ্গীরের মাতা পাশ ফিরিয়া শুইতেই তহমিনা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই অসাবধানে তাহার হাতের একটা আঙুল দুই দরজার মাঝখানে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া গেল। সে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল।

জাহাঙ্গীর তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া প্রশ্ন করিল,—কি হ'ল ভূণী কিছুতে কাম্‌ড়েছে?

ভূণী সে স্পর্শে কণ্টকিত হইয়া মনে মনে বলিল, কাম্‌ড়েছে বিষধর সাপে! বাহিরে বলিল, আঙুলটা দরজায় বড্ডো চিপে গেছে।

জাহাঙ্গীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকেও দেখিতে পাইল, সত্যসত্যই আঙুলটা নীল হইয়া উঠিয়াছে।

সে তাড়াতাড়ি আঙুলটা লইয়া চুষিতে চুষিতে বলিল, ইস্! রক্ত জ'মে নীল হয়ে গেছে! একটু ভিজে ন্যাকৃড়া আন্‌তে পার?

তহমিনা তাহার অঙ্গুলিতে জাহাঙ্গীরের উত্তপ্ত মুখের শোষণ যতই অনুভব করিতেছিল, ততই পুলকে তাহার অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। সে আর থাকিতে পারিল না—মূর্চ্ছিতার মত জাহাঙ্গীরের

অঙ্গে হেলিয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর দিশা হারাইল। বক্ষে তহমিনার তপ্তকোমল বক্ষের স্পর্শ পাইতেই তাহার রক্তে যেন তাহার পিতার লালসা-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

সে জীবনে সংযম হারায়নি, আজ সে সংযম হারাইল। তহমিনাকে বিপুল আবেগে বক্ষে পিশিতে পিশিতে জাহাঙ্গীর তাহার নিষ্কলঙ্ক গণ্ড অজস্র চুম্বন-কলঙ্কে ভরিয়া দিল।

তহমিনা সুখে, লজ্জায়, উত্তেজনায় শিথিল-তনু শিথিল-বসন হইয়া পড়িল। সে কিছুতেই যেন নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। মনে হইল তাহার নড়িবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত কে হরণ করিয়া লইয়াছে। সে শুধু তাহার দুই বাহু দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ জড়াইয়া দুই একবার অস্ফুট মিনতি করিল।

দেব-কুমার এক মুহূর্ত্তে রক্ত-লোলুপ পশু হইয়া উঠিল!

তহমিনা এইবার যেন কতকটা তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিল। সে তাহার শিথিল বাহু দিয়া এক একবার বিবসন-অঙ্গ আবৃত করিতে ও এক একবার জাহাঙ্গীরকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু সেও আর পারিল না। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব উন্মাদনায় তাহারও দেহ যেন টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। সে আর বাধা দিতে পারিল না। জাহাঙ্গীরের বক্ষ-তলে বহুক্ষণ অজ্ঞানবৎ পড়িয়া থাকিয়া তহমিনা উঠিয়া দাঁড়াইল। বস্ত্র সম্বরণ করিতে করিতে সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, একি সর্ব্বনাশ কর্‌লে তুমি আমার? আমি কি ক'রে মুখ দেখাব কা'ল?

জাহাঙ্গীর কোনো উত্তর না দিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

এ কি করিল সে। পঙ্ক-জ হইলেও নিজেকে পঙ্কের উর্দ্ধে শতদলের মত তুলিয়া ধরিবার তপস্যা সে করিতেছিল। তাহার যে স্বদেশ-মন্ত্রের পবিত্র অগ্নিতে অগ্নিশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে! স্বর্গে আরোহণ করিতে করিতে এ কোন্ রসাতলে সে পতিত হইল! অনুতাপে অনুশোচনায় তাহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল! কিন্তু একি! এক মুহূর্ত্তে সে যেন অতি বড় কাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার এখন মৃত্যুকে ভয় করিতেছে। আর সে অসঙ্কোচে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইতে পারে না। সে ত তহমিনার সর্ব্বনাশ করে নাই, সর্ব্বনাশ করিয়াছে সে নিজের।

জাহাঙ্গীর মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া অসহায় শিশুর মত রোদন করিতে লাগিল।

হঠাৎ কাহার শীতল স্পর্শে সে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—একটা প্রকাণ্ড গোখ্রো সাপ তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে শুনিয়াছিল, এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সাপের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।

সে মনে করিল, স্বয়ং বিধাতা বুঝি তাঁহার দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার অঙ্গ বহিয়া সাপ চলিয়া গেল।

তবে কি মৃত্যুও তাহাকে ঘৃণা করে? ক্লান্ত হইয়া সে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

১৬
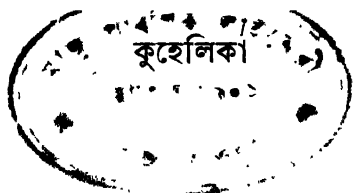
সকালে উঠিয়া ভূণীর মনে হইল, তাহার সকল দর্পের অবসান হইয়াছে। আজ সে পথের ভিখারিণী। দুই হাত পাতিয়া এখন তাহাকে ভিক্ষার তণ্ডুল-কণা গ্রহণ করিতে হইবে। কা'লও সে মনে করিয়াছিল, যত বড় দরিদ্র হোক তাহারা, তবু সে দেখাইয়া দিবে—আত্মসম্মান শুধু ধনীরই একচেটিয়া নয়। দারিদ্র্যের কঠিন দর্প দিয়াই সে ধনীর ঐশ্বর্য্যকে অতি বড় আঘাত করিবে।

আজ কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, আঘাত ত সে আর করিতেই পারিবে না, উল্টো যত আঘাতই আসুক—তাহাকে পড়িয়া পড়িয়া তাহা সহিয়া যাইতে হইবে।

হারুণ ফির্‌দৌস্ বেগম সাহেবার তার পাইয়া তাহার বাবাকে জানাইবা মাত্র—তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন—বাবা, এতদিনে খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন! ভূণীর মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, রাজরাণী হয়ে আমাদের ভুলে যাস্‌নে মা!

ভূণী কিন্তু কঠোর কণ্ঠে বলিয়াছিল, তাঁরা নিতে এলেও আমি তোমায় ছেড়ে যাবনা ত বাবা।

পিতা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, সে কি মা! হাতের লক্ষ্মীকে কি পায়ে ঠেল্‌তে হয়? অতবড় জমিদারীর বেগম নিজে আমার বাড়ী আস্‌ছেন—একি আমার কম সৌভাগ্য?

ভূণী রাগ করিয়া বলিয়াছিল,—তুমি ভুলে যাচ্ছ বাবা, আমার বাপ দাদার আজ অর্থ না থাক্‌লেও বংশ-গৌরবে তাঁরা তাঁদের চেয়ে অনেক বড়। বাড়ী বয়ে তাঁরা তাঁদের ঐশ্বর্য্যের দর্প দেখাতে আস্‌বেন, এ তোমরা সইলেও আমি সইতে পার্‌ব না।

জাহাঙ্গীরের মাতার প্রাণ-ঢালা স্নেহ আদরে তাহার কঠিন অভিমানের আবরণ টুটিয়া পড়িয়াছিল, তবু সে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের কথা ভাবিতেই পারে নাই।

কিন্তু কি করিতে কি হইয়া গেল! কেন সে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল? সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মোমি ব্যতীত তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই। তহমিনা উঠিতে গিয়াও যেন উঠিতে পারিল না। তাহার বুকে—শরীরে ভীষণ ব্যথা। শুইয়া শুইয়াই দেখিল, জাহাঙ্গীরের মাতা তাহাদের ঘরের দাওয়ায় মাটীতেই বসিয়া পড়িয়া কোরাণ 'তেলাওত্‌' করিতেছেন।

অপূর্ব্ব ভক্তি-মধুর সে কণ্ঠস্বর! তাহার একবর্ণও সে বুঝিতে পারিতেছিলনা, কিন্তু কেমন এক অজানা শ্রদ্ধায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। তাহার মনের অর্দ্ধেক গ্লানি যেন কাটিয়া গেল।

সে চেষ্টা করিয়া উঠিয়া পড়িল।

জাহাঙ্গীরের মাতা কোরান তুলিয়া রাখিয়া বলিলেন, উঠেছ মা সোনা? এ কি? তোমার মুখ চোখ অমন হয়ে গেছে কেন মা? অসুখ করেছে বুঝি?

তহমিনার মনে হইল, তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় মাতা সব বুঝিতে পারিয়াছেন। সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিল, জি, না।

জাহাঙ্গীরের মাতা তাহাকে বক্ষে টানিয়া ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, বালাই! এমন সব বদ-কায়েলী কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় মা!—তোমার মা কখন্ উঠ্বেন? তাঁকে যে দেখলুমইনা।

তহমিনার কিছু বলিবার আগেই মোমি বলিয়া উঠিল, মা যে পাগল। মা উঠ্লেই ত কাঁদতে স্নুরু কর্বে বড় ভাইয়ের নাম ক'রে!

জাহাঙ্গীরের মাতা সব শুনিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। মোমিকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোমার মা ভাল হয়ে যাবে মা! আমরা তোমার মাকে কল্‌কাতা নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাব। আর, যদ্দিন তোমার মা ভাল হয়ে না উঠেন, তদ্দিন আমি হব তোমার মা, কেমন?

কলিকাতা যাওয়ার কথায় মোমি অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিল। সে কলিকাতা সম্বন্ধে তাহার দাদা-ভাইএর কাছে কিছু কিছু গল্প শুনিয়াছিল। সে কলিকাতা সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতে লাগিল। জাহাঙ্গীরের মাতা হাসিয়া সে সবের উত্তর দিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলেই জাগিয়া উঠিল। গ্রামে বেগম আসিয়াছে বলিয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। ঘরে মেয়েদের ভিড় লাগিয়া গেল।

জাহাঙ্গীরের মাতা বা দেওয়ান সাহেব বিবাহের কোনো কথাই তুলিলেন না।

জাহাঙ্গীরের মাতা হারুণের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি। অবশ্য ছেলের বন্ধুর বাড়ী দেখ্তে আসাও আমাদের এখানে আসার আর একটা কারণ। আমি পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রাম কখনো দেখিনি—এই অবসরে তাও দেখা হয়ে গেল।

হারুণের পিতা বিনয়-কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন,—আপনাদের মত লোক যে গরীবের বাড়ী এসেছেন, এই আমার পরম সৌভাগ্য। জাহাঙ্গীর বাবাজী না এলে ত আপনার পদার্পণ হ'ত না এ অজ পাড়াগাঁয়ে।—আর আপনাকে ভিক্ষা দেওয়ার মত কোনো কিছুই নেই আমার।

জাহাঙ্গীরের মাতা বলিলেন, আপনার যে সন্তান রত্ন আছে—তারাই যে সাত রাজার ধন। আমি হারুণকে ভিক্ষা চাচ্ছি। সে আমার নূতন জমিদারী ষ্টেটের ম্যানেজার হবে। আপাততঃ সে মাসে তিন শ' টাকা ক'রে পাবে। আমার একটীমাত্র ছেলে, কিন্তু সে কিছু নেয়ওনা, দেখেও না। সে এরি মধ্যে আধা-দরবেশ হয়ে গেছে। হারুণ কিন্তু আমার ছেলের মতই থাক্‌বে—আর তার সাথে সাথে আপনাদেরও কল্‌কাতা যেতে হবে। হারুণের কাছেই আপনারা থাক্‌বেন। হয়ত চিকিৎসা হ'লে ওর মাও ভাল হয়ে উঠ্‌তে পারেন।

হারুণের পিতা বহুক্ষণ কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। তবে কি ভূণীকে পুত্রবধূ করিতে পারিবেন না বলিয়াই তাঁহার এই জমিদারী চা'ল? ইহা কি তাহারি ক্ষতিপূরণ? তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। ক্ষুব্ধ স্বরে তিনি বলিলেন, আপনার দয়ার জন্য আপনায় অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি বেগম সাহেবা, কিন্তু হারুণের তিন শ' টাকা মাইনে পাবার মত ত গুণ বা কর্ম্মক্ষমতা নাই। আপনিও আমার ছেলের বন্ধুর জননী, কাজেই আত্মীয়াও বল্‌লেই হয়। আমাদের খুবই অভাব, তবু মাফ করবেন—আপনার কাছ থেকে এ দান নিতে আমার হাত উঠ্‌বে না।

দেওয়ান সাহেব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, বেগম সাহেবাকে আত্মীয়ার মতই বক্‌ছেন কেন খোন্দকার সাহেব, উনি ত আপনার বড়

আত্মীয়া হতে চলেছেন—দুদিন পরে বেয়ান হবেন—ওঁকে যদি এমন ক'রে ফিরিয়ে দেন, আমরা সকলে বড় ব্যথা পাব। এখানে আজ সকালে গ্রামের লোকের মুখে শুনেছি আপনাদের বাড়ীতে কোনো ভিখারী সোনা রূপা না পেয়ে ফিরে যেত না! আমরাই কি তা' হ'লে শুধু হাতে ফিরে যাব?

হারুণের পিতা এইবার গলিয়া গিয়া বেদনাক্ত কণ্ঠে বলিলেন, সেদিন ত আমাদের নাই দেওয়ান সাহেব! এখন এক মুঠো চাউল দিতে পারিনে ভিখিরিকে। আমার ওয়ালেদ্ সাহেব পর্যান্ত সত্যই আমাদের বাড়ীর এই রেওয়াজ ছিল। আমিও তা দেখেছি মাত্র, কিন্তু এ কমবখ্‌তা বাপ-দাদার সে ট্র্যাডিশন্ বজায় রাখ্‌তে পারেনি!

জাহাঙ্গীরের মাতা বলিয়া উঠিলেন, হারুণ আর তহমিনাই ত আপনার সোনার চেয়েও অমূল্য রত্ন রয়েছে—আমরা ঐ সোনাই ত চাচ্ছি!

হারুণের পিতা বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আর আমায় লজ্জা দেবেন না, দোহাই! গোস্তাখীর যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছেন। আমি আপনাদের যে ধরণের ধনী মনে করেছিলুম—আপনারা তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাইরের ঐশ্বর্য্য আপনাদের অন্তরের ঐশ্বর্য্যকে দেখ্‌ছি এতটুকু মলিন করতে পারে নি।—ভিক্ষা ভিক্ষা বল্‌বেন না—ওরা আজ থেকে আপনারই সন্তান হ'ল। আমি ত থেকেও নেই। আমি অন্ধ হয়ে ওদের কোনো কিছুই দেখ্‌তে পারিনে। বাপ অন্ধ, মা পাগল। ওদের ত বাপ মা থেকেও নেই! এখন থেকে আপনারাই ওদের বাপ মা হ'লেন। এখন আমি শান্তিতে মর্‌তে পার্‌ব। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ ভাঙিয়া আসিল, আর বলিতে পারিলেন না।

দেওয়ান সাহেব বলিলেন, শুধু ওদের ত নিতে আসিনি, আপনাদের সকলকেই যে নিতে এসেছি! আপনার পৈতৃক ভিটে চিরদিনের জন্য ছেড়ে যেতে বল্‌ছিনে, কিছুদিন কল্‌কাতা থেকে আপনাদের দুই জনারই চিকিৎসাপত্র করান—খোদা যদি ভাল ক'রে তোলেন আপনাদের—আবার ফিরে আস্‌বেন এই বাড়ীতে।

হারুণের পিতা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, ভূণীর সাদি কি তা হ'লে কল্‌কাতাতেই সম্পন্ন করতে চান? কিন্তু তা ত হ'তে পারেনা সাহেব!

অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, বিবাহ গ্রামেই হইবে। কিন্তু কিছুদিনের জন্য সেটা স্থগিত রহিল। হারুণ ইতিমধ্যে তাহার এই পুরাতন বাড়ীর সংস্কার করিবে। হারুণের পরীক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত হারুণের পিতা হারুণের জমিদারী কার্য্যে সাহায্য করিবেন। কথা হইল, এখন গ্রামের কাহাকেও বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে না। হারুণ জমিদারী ষ্টেটে চাকুরি লইয়া সপরিবারে কিছুদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে—ইহাই সকলকে জানানো হইবে। ইহাও স্থির হইল, আর তিন দিনের মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া যাত্রা করিতে হইবে।

হারুণের পিতা ভয় করিয়াছিলেন, ইহাতে হয়ত একমাত্র ভূণীরই আপত্তি হইবে। কারণ, কা'ল পর্য্যন্ত সে নাগিণীর মত ফণা ধরিয়াছে। কিন্তু ভূণীকে সব কথা বলার পর সে যখন এতটুকুও আপত্তি উত্থাপন করিল না—তখন পিতা বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ সন্ধান করিতে গিয়া মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন, বেটীর আমার বর চোখে ধরেছে কিনা, তাই আর কথাটী কইতে পার্‌লে না!

হারুণের মাতা কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া হৈ চৈ করিয়া তুলিলেন। এই সব অজানা লোকজন দেখিয়া কখনো তিনি হাসিতে, কখনো বা

তারস্বরে মীনাকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মায়ের ডাকে জাহাঙ্গীর ভিতরে আসিতেই উন্মাদিনী "ঐ আমার মীনা এসেছে, আয়, আয়, সাইকেল দেবো" বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। মাতার আদেশে জাহাঙ্গীর সেইখানে অপরাধীর মত বসিয়া রহিল।

সে আর চোখ তুলিয়া কাহারও পানে চাহিতে পারিল না! সব চেয়ে মুসকিল হইল ভূণীর, সে বাহির হইতে পারেনা, অথচ বাহির না হইলেও নয়।

লজ্জার মাথা খাইয়া ভূণীকে দুই একবার বাহিরে আসিতে হইল। সে না আসিলে চলিবেই বা কি করিয়া? এত লোকের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ত তাহাকেই করিতে হইবে।

জাহাঙ্গীরের মাতা হারুণের মাতাকে অনেক বুঝাইয়া জাহাঙ্গীরকে বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া তহমিনাকে লইয়া পড়িলেন। রান্নার সমস্ত ব্যাপার তাঁহার বাঁদিদের হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি ভূণীকে স্নান করাইয়া যখন হীরা-জহরত বসন-ভূষণে সাজাইয়া তুলিলেন, তখন গ্রামের মেয়েরাই বলিল, ভূণীর যে এত রূপ—তাহা তাহারাও জানিত না। অলঙ্কার ও কাপড় চোপড়ের বাহার দেখিয়া সকলেই বলিল, মেয়ে বরাত লইয়া আসিয়াছিল বটে! কেহ কেহ ইহাও বলিল যে, অত গয়না কাপড় দিয়া সাজালে তাহার মেয়েকেও ইহার চেয়ে কম সুন্দর দেখাইত না।

মোমি ও মোবারক তাহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল।

গ্রামের সমস্ত বাড়ীতে সন্দেশ মিঠাই পরিবেশন করা হইল। সকলে এই সন্দেশ দেওয়ার অর্থ অনুরূপ করিল। এই সন্দেশের মূলে যে ভূণী, ইহা লুকাইলেও কাহারও আর বুঝিতে বাকী থাকিল না।

দুই দিনেই দেওয়ান সাহেব ও জাহাঙ্গীরের মাতা গ্রামের প্রা: সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন তাঁহাদের সহজ সরল নিরহঙ্কার ব্যবহারে।

গ্রামের আত্মীয় স্বজনের নিকট অশ্রু-চোখে বিদায় লইয়া হারুণেরা তাহাদের পৈতৃক ভিটার মায়া কাটাইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।

হারুণদের নিকট-আত্মীয় একজন তাহাদের বাড়ী দেখাশোনা করিবেন কথা থাকিল। ইতিমধ্যে হারুণ আসিয়া নতুন করিয়া বাড়ী তৈরী করিয়া যাইবার পর তাহার পিতা মাতা ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া আত্মীয় স্বজনকে আশ্বাস দিল।...

হারুণের মাতা জাহাঙ্গীরকে দেখা অবধি আর বেশী কান্নাকাটি করেন নাই। তাঁহাকে বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহার মীনা বড় হইয়া বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। উন্মাদিনী তাহাই বিশ্বাস করিয়াছে। কাজেই তাঁহাকে লইয়া যাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

১৭

ষ্টেশনে পঁহুছিয়াই জাহাঙ্গীর দেখিল, সারা গায়ে ভস্ম-বিভূতি মাখা জটাজুটধারী এক পোণে-ষোল-আনা নাগা সন্ন্যাসী তাহার চিম্‌টার ইঙ্গিতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল।

জাহাঙ্গীর দেখিল সন্ন্যাসী ইঙ্গিত করিয়াই রেল-লাইনের অপর পারে এক বৃক্ষনিম্নে গিয়া বসিলেন। সেখানে আরো বহু নাগা সন্ন্যাসী কেহ ধূনী জ্বালাইয়া কেহ ধ্যান করিতেছে, কেহ গাঁজা টানিতেছে, কেহ ভজন-গান করিতেছে।

জাহাঙ্গীর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিল। জিনিসপত্র নামানোর হাঙ্গামে কেহ অত লক্ষ্য করিল না।

সন্ন্যাসী-দল হইতে কিছু দূরে একটু নিরালায় গিয়া সেই সন্ন্যাসী বলিল, তুমি আমাকে চেননা। অবশ্য, আমি তোমায় চিনি। আমাদের অত্যন্ত বিপদ। আজ ভোরে তোমার প্রমত্‌দা' ও পিনাকীর মাসীমা অস্ত্রশস্ত্র সমেত ধরা পড়েছেন। তোমার গাড়ীতে তুলে দেবেন ব'লে তাঁরা গরুর গাড়ীতে ক'রে সে সব আন্‌ছিলেন, রাস্তায় পুলিশ পাকড়েছে। এ খবর পুলিশ বাইরে প্রকাশ হ'তে দেয়নি, অন্যান্য সকলকে ধর-পাকড়ের জন্য। মাসীমাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রমত্তকে ধরা দিতে হয়েছে—আমরা সকলে পালিয়ে এসেছি। পুলিশদের দু'জন মারা গেছে আমাদের গুলিতে—তোমার ওপর বজ্রপানির আদেশ, মাসিমার মেয়ে চম্পাকে নিয়ে কল্‌কাতায় অপাততঃ তোমাদের বাসায় রাখ্‌বে। তারপর

দু' একদিনের মধ্যে বজ্রপাণি লোক পাঠিয়ে তাকে নিয়ে যাবেন। চম্পাকে বোর্‌কা পরিয়ে মুসলমান মেয়ে সাজিয়ে রেখেছি। সে একটু পরেই ষ্টেশনে আসবে—তুমি তাকে তোমাদের গাড়ীতে তুলে নিও। খুব সাবধান কিন্তু, পুলিশে ভয়ানক কড়া পাহারা দিচ্ছে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে। চম্পার সাথে এক বাক্স মালপত্র আছে। সাবধান! প্রাণ দিতে হয় দিও, তবু সে সব যেন বে-হাত না হয়। যাও!—বলিয়াই সন্ন্যাসী সেইখানে বসিয়া গাঁজার কলিকায় দম দিতে দিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—বোম্ কালী কাল্‌কাত্তাওয়ালী......

জাহাঙ্গীর চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কিন্তু ভয় পাইলে চলিবে না, ভাবিবারও অবকাশ নাই। তাহাকে প্রাণ দিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। সে ষ্টেসনে আসিয়া দেখিল, জিনিসপত্র স্যালুনে উঠানো হইতেছে। গাড়ী আসিবার তখনো অনেক দেরী।

তাহার মাতা ভূণী মোমি প্রভৃতি স্যালুনে উঠিয়া বসিয়া ছিলেন। স্যালুনটা প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম হইতে কিছু দূরে ছিল। সে দেখিল, আর একখান পাল্কী তাহাদের স্যালুনের দিকে আসিতেছে। সে তাহার মাতাকে বলিল, মা, বলতে ভুলে গেছি, আমাদের মৌলভী সাহেবের ভাগ্নী আমাদের সাথে যাবে, দু' একদিন আমাদের বাড়ীতে সে থাক্‌বেও। ডায়োসিশান্ কলেজে সে পড়ে। মৌলবী সাহেব বিশেষ কাজে আজ যেতে পার্‌লেন না, উনি দু' একদিনের মধ্যেই কল্‌কাতা এসে পঁহুচ্‌বেন।

বলিতে বলিতে পাল্কী আসিয়া স্যালুনের নিকট থামিল এবং একটী বোর্‌কা-পরা তরুণী নামিয়া স্যালুনে আসিয়া উঠিয়া বসিল। আসিয়াই সে মুসলমানী কায়দায় জাহাঙ্গীরের মার পদধূলি লইল।

বাঁদিরা তাহার বাক্স প্যাঁট্‌রা স্যালুনে তুলিয়া লইল। মাতা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, এবার বোর্‌কাটা খু'লে ফেল মা, যা গরম সেদ্ধ হয়ে গেছ বুঝি।

চম্পা সামনের খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়া বোর্‌কা খুলিয়া ফেলিল। তাহার রূপে সকলের চক্ষু যেন ঝল্‌সিয়া গেল। ভূণীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। সত্যসত্যই চম্পার কাছে তাহার রূপ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল।

বাঁদিরা বলিয়া উঠিল, বিবিসা'ব, আপনার বাস্‌কে কি রাখ্‌ছেন ক'ন ত! পাতর রাখ্‌ছেন না ত? মাইয়ো মা, যা ভারী!

চম্পা হাসিয়া বলিল, বই পত্তর আছে কিনা, তাই অত ভারি!

মা মুগ্ধনেত্রে তাহাকে দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, এ রূপ নয়, রূপের শিখা। রূপের চেয়ে তেজ দীপ্তি আরো বেশী। চক্ষুতে অদ্ভূত জ্যোতি, তাকানো যায় না।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নামটা কি মা? চম্পা কিছু বলিবার আগেই জাহাঙ্গীর বলিল, ওর নাম আমিনা।

মাতা বলিলেন, এঁর কথা ত তুই কখনো বলিস্‌নি খোকা!

জাহাঙ্গীর বলিল, ওঁর কথা ত আমি আগে জান্‌তুমনা মা। আমি ষ্টেশনে আস্‌তেই মৌলবী সাহেব ওঁকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আমাদের সাথে নিয়ে যাবার জন্য দিয়ে গেলেন। মৌলবী সাহেব আমাদের সাথে সেদিন যেতে পারেননি ব'লে লজ্জায় আর তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌লেন না। তাছাড়া ওঁর কাজও ছিল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা'র অসুখ করেছিল শুনেছিলুম, এখন তিনি ভাল আছেন ত?

চম্পা ওর্ফে আমিনা বলিল, জি হাঁ। মা চেঞ্জে যাবেন কা'ল, তাই আমি কল্‌কাতা চ'লে যাচ্ছি। আমার পড়াশুনার ক্ষতি হ'বে ব'লে তাঁর সাথে গেলুম না। কয়দিন আপনাদের তক্‌লিফ্‌ দেবো।

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ছি মা, ওকথা বল্‌তে নেই। ও তোমার নিজের বাড়ীই মনে কর্‌বে। হাঁ দেখ, তোমার সাথে মা পরিচয় ক'রে দিতে ভুলে গেছি, এই হচ্ছে তহমিনা আমার হবু-বৌমা। এ হচ্ছে ওর ছোট বোন্‌ মোমি, ইনি হচ্ছেন ওর মা—শরীর খারাপ তাই ঘুমোচ্ছেন।

চম্পা ভূণীর পাশে আসিয়া বসিল, কিন্তু তাহার মুখ যেন কেমন ম্লান হইয়া গেল। ভূণীর তাহা চক্ষু এড়াইল না। চম্পা ভূণীর সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুইজনের কেহই যেন সহজ হইতে পারিল না।

জাহাঙ্গীর বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে চম্পার পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অপূর্ব্ব তাহার আত্মসংযম। আজই সকালে যে এত বড় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে—তাহার কোনো দুর্ভাবনার ছায়া পর্য্যন্ত পড়ে নাই তাহার চোখে মুখে। ও যেন বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

চম্পা হঠাৎ জাহাঙ্গীরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে বৌ চুরি কর্‌তে এসেছিলেন ত! কাউকে এতটুকু জান্‌তে দেননি! বলিয়াই জাহাঙ্গীরের মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মা হয়ত কি ভাব্‌ছেন! কলেজে প'ড়ে আমরা হয়ত বেহায়া হয়ে গেছি!

মা হাসিয়া বলিলেন, না মা! আমাদের বাড়ীতেও পর্দ্দার অত কড়াকড়ি নেই। তোমার মুখে বোর্‌কা দেখে একটু বরং আশ্চর্য্য হয়ে গেছিলাম।

চম্পা হাসিয়া বলিল, কি করি মা, মামার জন্য আমায় বোর্‌কা নিতে হয়েছিল, মামা একটু গোঁড়া।

বলিয়াই ভূণীর পানে ফিরিয়া বলিল, আমি কিন্তু তাই তোমায় 'আপনি' বল্‌তে পার্‌ব না, আর বৌদি ব'লে ডাক্‌ব—কেমন? ভাবী টাবির চেয়ে বৌদি অনেক ভাল শোনায়।

ভূণী এইবার হাসিয়া মুখের ঘোমটাটা বেশী করিয়া টানিয়া দিল।

এমন সময় ক্লান্ত হারুণ আসিয়া বলিল, মা, সব জিনিসপত্র উঠে গেছে। মাতা তাহাকে গাড়ীতে উঠিতে বলিয়া চম্পাকে বলিলেন, এর বোধ হয় নাম শুনেছ আমিনা, এই আমাদের কবি হারুণ, তহমিনার বড় ভাই। আর হারুণ, ইনি আমিনা, তোমাদের প্রফেসর আজহার সাহেবের ভাগ্‌নী। আমাদের সাথে কল্‌কাতা যাচ্ছেন। ডায়োশিশানে পড়েন।

চম্পা আদাব করিয়া বলিল, আপনার যথেষ্ট নাম শুনেছি। কিছু কিছু কবিতা পড়েওছি। চমৎকার লেখেন আপনি। আমার সৌভাগ্য যে, আপনার দেখা পেলুম!

হারুণ অভিভূতের মত চম্পার পানে চাহিয়াছিল, সে যেন তাহার কল্পলোকের মানস-লক্ষ্মীকে স্বপ্নে দেখিতেছে! চম্পার এই প্রশংসায় তাহার মনে হইল, তাহার কবি-জীবন ধন্য হইয়া গেল। সে ইহার প্রত্যুত্তরে একটা কথাও বলিতে পারিল না; সমস্ত মুখ তার আরক্তিম হইয়া উঠিল।

ট্রেণ আসিয়া পড়িল। তাহাদের স্যালুনকে টানিয়া ট্রেণের পশ্চাতে জুড়িয়া দিল। জাহাঙ্গীর দেখিল, জনকতক টিকটিকি তাহাদের স্যালুনের সন্মুখ দিয়া কেবলি যাতায়াত করিতেছে।

জাহাঙ্গীর কিছু বলিবার আগেই দেওয়ান সাহেবের হুঙ্কার শোনা গেল। তিনি নামিয়া তাহাদের এক তাড়া দিতেই তাহারা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল।—গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

জাহাঙ্গীর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আজিকার বিপদের ছায়া তাহার মুখে ঘন বেদনার ছাপ মারিয়া দিয়াছিল। সে ভাবিতে লাগিল, যে কোনো মুহূর্ত্তে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। বাথরুমে ঢুকিয়া সে তাহার পিস্তলটা পরীক্ষা করিয়া ভাল করিয়া তলপেটে কোঁচার নীচে সামলাইয়া রাখিল। আসিয়া চম্পাকে কি যেন ইঙ্গিত করিল, চম্পাও চক্ষু ইঙ্গিতে কি যেন বলিল। ভূণী ঘোম্‌টার আড়াল হইতে তাহা দেখিতে পাইল। তাহার শরীর মন জ্বালা করিয়া উঠিল। ইহারা তাহা হইলে শুধু আজিকার পরিচিত নয়।

মাতা জাহাঙ্গীরের মুখ চোখ দেখিয়া বলিলেন, খোকা, তোর মুখ চোখ অমন কালো হয়ে গেছে কেন? কিছু খাস্‌নি বুঝি এখনো? তুই আর হারুণ কিছু খেয়ে নে ত! কি রকম মুখ চোখ বসে গেছে তোর!

জাহাঙ্গীর বলিল, না মা, ক্ষিদে পায়নি মোটেই। এম্‌নি শরীরটা কেমন খারাপ লাগ্‌ছে।

মা বল্‌লেন, শরীর খারাপ কর্‌ছে কেন রে? যা ছেলে তুই, কারুর কথা ত শুন্‌বিনে। অতটা রাস্তা হেঁটে এলি, কিছুতেই পাল্কিতে চড়্‌লিনে! দেখি—বলিয়া কপালে হাত দিয়া বলিলেন তোর গাও যে গরম হয়েছে খোকা! শুয়ে পড়্‌ শুয়ে পড়্‌ এইখানে।

জাহাঙ্গীর শুইয়া পড়িল। গাড়ীর সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চম্পা হাসিয়া বলিল, ব্যস্ত হবেন না মা, নতুন দায়িত্ব ঘাড়ে নিচ্ছেন কিনা, তারই চিন্তায় ওঁর শরীর হয়ত একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

মা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, না মা, তুমি জাননা, ওর শরীরের ওপর একটুও যত্ন নেই, সত্যিই ওর শরীর খারাপ করেছে!

চম্পা বলিল, তাত দেখেই বোধ হচ্ছে। ওঁর শরীরটা যেন সন্ন্যাসীর, যত রকমে পেরেছেন, ওকে নির্য্যাতন করেছেন! লক্ষ্য রাখ্‌বেন মা—সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী না হয়ে যান!

মা হাসিয়া বলিলেন, এবার যার ওপর লক্ষ্য রাখার ভার পড়্‌ছে—সেই দেখ্‌বে মা। আমি ত ওকে বাগে আন্‌তে পারিনি—দেখি অন্য কেউ পারে কিনা.

চম্পা ভূণীর কানে কানে বলিল, তুমি বেশ ভাল ঘোড়সওয়ার ত বৌদি? জোর লাগাম ক'শে রেখো। নৈলে এ বেহেড ঘোড়া ছুট্‌তে শুরু কর্‌লে আর আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বে না!

ভূণী জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, তোমার মত কথার চাবুক থাক্‌ত হাতে ভাই, তা হ'লে হয়ত পারতুম। ও ঘোড়া হয়ত একা তুমিই বাগে আন্‌তে পার!

চম্পা রাম-চিম্‌টী কাটিয়া বলিল, এই ননদ-নাড়া শুরু হ'ল তা হ'লে!

ভূণী উঃ করিয়া শব্দ করিয়া বলিল, তুমি দেখ্‌ছি স্বর্পনখা!

চম্পা হাসিয়া বলিল, আর উনি বুঝি রাবণ, আর তুমি সীতা!

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ওধারে রাম-লীলা শুরু হ'ল, হারুণ কবিতার খাতা নিয়ে বস্‌ল, আমি ততক্ষণ কুম্ভকর্ণের ডেপুটীগিরি করি।

বলিয়াই চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িল। মাতা পুত্রের ললাট-দেশে সস্নেহ কর সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

১৮
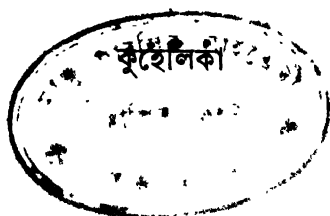
গাড়ী বর্দ্ধমানে আসিয়া পঁহুছিতেই কাহাদের চঞ্চল সবুট পদশব্দে জাহাঙ্গীরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাঙ্গীর উঠিয়া দেখিল, সকলে ঘুমাইয়া গিয়াছে। রাত্রি কতটা হইবে, তাহা সে আন্দাজ করিতে পারিল না। কেবল হারুণ একাকী জাগিয়া এক মনে বোধ হয় কবিতা লিখিতেছে। জাহাঙ্গীর একদল সশস্ত্র গোরা ও পুলিশ তাহাদের স্যালুন বারকতক প্রদক্ষিণ করিয়া স্যালুনের পূর্ব্বের গাড়ীটাতে উঠিয়া বসিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

জাহাঙ্গীরের বুঝিতে বাকী রহিল না—কোন্ বজ্র তাহার শির লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সে কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ধাক্কা দিয়া হারুণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া সে চুপি চুপি বলিল, হারুণ, ভীষণ বিপদ! তোমায় একটা কাজ কর্‌তে হবে।

হারুণ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া জাহাঙ্গীরের মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সে জাহাঙ্গীরের এই অহেতুক ভীতির কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

জাহাঙ্গীর বলিল, অনেকগুলো গোরা আর পুলিশ আমাদের গাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে যাওয়া আসা কর্‌ছিল, দেখেছ? হারুণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হাঁ।

জাহাঙ্গীর বলিল, ওরা খুব সম্ভব আমায় এ্যারেষ্ট্ কর্‌বে। হয়ত আমাদের গাড়ীও সার্চ্চ কর্‌বে। সার্চ্চ্ যদি করে—তা হ'লে আমরা

সকলেই ভীষণ বিপদে পড়্‌ব। তোমাকে সব কথা খু'লে বলি, যাকে আমিনা ব'লে ভেবেছ—সে আমিনা নয়—আমাদের বিপ্লবীদলের একটী মেয়ে। ওর কাছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে। এরা সকলেই ঘুমুচ্ছে—এই অবসরে আমি আর ঐ আমিনা নেমে পড়্‌ব পরের ষ্টেশনে। তুমি আস্তে ওর বাক্সটা নামিয়ে দেবে। কোনো ভয় ক'রোনা। মাকে ভাব্‌তে মানা ক'রো—আমি কা'লই মোটরে ক'রে বাড়ী পঁহুচ্‌ব তোমাদেব সাথে সাথে।

হারুণ বোবার মত বসিয়া রহিল। মনে হইল তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। মাকে বলো—আমিনার মামা তার করায় বর্দ্ধমান ষ্টেশনে তা পেয়ে আমি তা'কে আবার অণ্ডাল পৌঁছে দিতে যাচ্ছি—তার মায়ের ভয়ানক অসুখ বেড়েছে। অণ্ডাল থেকে তার মামা এসে নিয়ে যাবেন।

বলিয়াই সে আস্তে ধাক্কা দিয়া চম্পাকে জাগাইল। চম্পাকে কোড-ওয়াড়ে কি কথা বলিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার বুকের নীচে কি পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

তাহার পর বাক্স দুইটী আস্তে আস্তে দোরগড়ায় টানিয়া দরজা খুলিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। জাহাঙ্গীর আবার তাহাকে কি বলিতে সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিয়া হিন্দু-সধবার বেশে সাজিয়া বাহির হইয়া আসিল। জাহাঙ্গীরও তাড়াতাড়ি ইউরোপীয়ান বেশে সজ্জিত হইয়া লইল। ইত্যবসরে ট্রেণ শক্তিগড়ে একটু দাঁড়াইয়াই ছাড়িবার উপক্রম করিতে তাহারা ধীরে দুইজনে দুইটা বাক্স লইয়া নামিয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর চাহিয়া দেখিল, সৌভাগ্যক্রমে গোরা বা পুলিশের কেহ সেদিকে লক্ষ্য করিল না। তাহারা ইহাদের কলিকাতায় পাকড়াও করিবে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া হয়ত শুইয়া ছিল।

হারুণ তেমনি পাথরের মত বসিয়া রহিল। তাহার বাক্‌শক্তি এবং নড়িবার শক্তি দুই যেন কে হরণ করিয়া লইয়াছে।

জাহাঙ্গীর ও চম্পা বিপরীত দিক্‌কার প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া দাঁড়াইতেই বর্দ্ধমান যাইবার ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন টিকিট করিবার সময় ছিল না। চম্পাকে একখানা শূন্য ফার্ষ্ট্‌ক্লাসে তুলিয়া দিয়া সে গার্ডকে বলিয়া আসিল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। চম্পা বলিল, বর্দ্ধমানে নামা হবে না। সেখানে পুলিশে নিশ্চয়ই কড়া পাহারা দিচ্ছে। স্থির হইল তাহারা রাণীগঞ্জে নামিয়া সেখান হইতে ট্যাক্সি করিয়া কলিকাতা আসিবে। তাহা হইলে ধরা পড়িবার কোনো সম্ভাবনা থাকিবে না।

জাহাঙ্গীর ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। চম্পা বলিল, দাদা তোমার মাথাটা টিপে দেবো? জাহাঙ্গীর আপত্তি করিল না। চম্পা তাহার চম্পক অঙ্গুলি দিয়া জাহাঙ্গীরের কপাল টিপিয়া দিতে দিতে বলিল, দাদা, তোমার মা হয়ত এতক্ষণ কি মনে কর্‌ছেন!

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, হাঁ, মা হয়ত মনে করছেন, ছেলে আমার মেয়েটাকে নিয়ে উধাও হ'ল!

চম্পা জাহাঙ্গীরের হাতে চিম্‌টি কাটিয়া বলিল, যাও, তুমি ভয়ানক দুষ্টু। আমাদের ও কথা বল্‌তে নেই।

জাহাঙ্গীর গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যি তাই। আমাদের যে মন্ত্রে দীক্ষা, তাতে কেউ পুরুষ নারী ব'লে নেই। সেথা সকলে অগ্নি-সখা। তা' নৈলে তোমার মত রূপে গুণে অপরূপাকে কি এত কাছে পেয়ে নিজেকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তুম?

চম্পা সরিয়া বসিয়া বলিল, সত্যি তোমার সে রকম দুর্ব্বলতা আস্‌তে পারে ব'লে তুমি ভয় কর?

জাহাঙ্গীর উঠিয়া বসিয়া বলিল, করি চম্পা। আমি আমাকে যত বেশী জানি, তুমি ত তা জাননা।

চম্পা ভয়ের ভান করিয়া বলিল, তবে তোমার সঙ্গে আসা আমার উচিত হয়নি। অথচ, প্রমতদা যাবার সময় আমায় তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস কর্‌তে মানা করেছিলেন। তুমি নাকি নারী জাতিটাকেই ঘৃণা কর।

জাহাঙ্গীর বলিল, কতকটা তাই ওদের বিশ্বাস করিনা—শ্রদ্ধা করিনা ব'লেই আমার এত ভয়। যাকে শ্রদ্ধা করিনা, তার অসম্মান কর্‌তে আমার বাধ্‌বে না।

চম্পা প্রশ্ন করিল, এই যদি তোমার মনের ভাব তা হ'লে বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছ কেন এক নারীকেই?

জাহাঙ্গীর বলিল, বিয়ে কর্‌ব কিনা জানিনে চম্পা, কিন্তু তার সর্ব্বনাশের আর কিছু বাকী রাখিনি।

হঠাৎ সাপ দেখিলে লোক যেমন চমকিয়া উঠে, চম্পা তেমনি চমকিয়া উঠিয়া বলিল, এ তুমি কি বল্‌ছ দাদা? হয় তুমি মিথ্যা কথা বল্‌ছ—কিম্বা পাগল হয়েছ।

জাহাঙ্গীর তেমনি স্থিরকণ্ঠে কহিল, আমি মিথ্যাও বলিনি পাগলও হয়নি চম্পা! এর পরে তোমার সাথেও হয়ত আর আমার দেখা হবেনা। এই পৃথিবীর অন্ততঃ একজন আমার বেদনার কাহিনী শুনে রাখুক—কি অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমি এসেছিলুম—কি হ'তে পার্‌তুম অথচ কি হলুম!

চম্পা কণ্ঠে বেদনা ও মিনতি ঢালিয়া দিয়া কহিল, দাদা, তুমি একটু শুয়ে ঘুমোও দেখি। আমি জেগে থেকে রাণীগঞ্জে ট্রেণ এলেই উঠিয়ে দেবো। তোমার কিচ্ছু আমি জান্‌তে চাইনে। কি হবে আমার জেনে? তোমায় দেখেছি, শ্রদ্ধা করেছি—শুধু এইটুকুই আমার যথেষ্ট।

জাহাঙ্গীর বাধা দিয়া বলিল, না চম্পা, তোমাকে শুন্‌তেই হবে। আমি এতদিন ভেঙে পড়িনি বা উচ্ছন্নে যাইনি, প্রমত্‌দা' ছিলেন ব'লে। এখন আর আমার ভয় নেই। হয় স্বর্গারোহণ কর্‌ব,—নয় একেবারে যে পাঁক থেকে আমি উঠেছি সেই পাঁকেই ডুবে যাব!

চম্পা প্রতিবাদের স্বরে বলিল, তুমি পাঁক থেকে উঠ্‌তে পারনা— যদি তা শুনেও থাক তা মিথ্যা।

জাহাঙ্গীর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, তুমি হয়ত আমাকে পদ্মফুল মনে কর্‌ছ—কিন্তু তা নাকি গোবরেও ফোটে চম্পা। কিন্তু আমি যে আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি! তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে—সে পরীক্ষায় আমি আমার মূলের পাঁককে দেখ্‌তে পেয়েছি। আর সে পাঁক অন্যের গায়েও গিয়ে লেগেছে।

চম্পা কি ভাবিল। তাহার পর বলিল, তুমি কি ভূণীর কথা বল্‌ছ? সত্যিই কি তুমি তার কোনো ক্ষতি করেছ?

জাহাঙ্গীর উত্তেজিত হইয়া বলিল, শুধু ক্ষতি চম্পা, যে ক্ষতির চেয়ে বড় ক্ষতি মেয়েলোকের হ'তে পারেনা, আমি তার সেই ক্ষতি করেছি। এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাকে জয় ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লাম না।

জাহাঙ্গীরের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া বলিতে লাগিল, তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তাকে বিয়ে

করা। কিন্তু সে ত জানেনা—আমি আমার পিতার কামজ সন্তান,—আমার মা কল্‌কাতার এক বিখ্যাত বাইজি! একথা জান্‌লে সে কি আর আমায় শ্রদ্ধা কর্‌তে পার্‌বে? আমার মূলে যদি পাঁক না থাকৃত, তা হ'লে আমি কি অত বড় পাপ কর্‌তে পার্‌তাম? আমার প্রতি রক্ত-কণিকায় যে ভোগী পিতা বেঁচে রয়েছে—আমি ভুল্‌লেও সে আমায় যে কেবলি নরকের দিকে টান্‌বে চম্পা! এত ঐশ্বর্য্য, মা যা-ই হোন তাঁর এত স্নেহ—এই নিয়ে আর যে-কেউ হয়ত পরম সুখে দিনাতিপাত কর্‌তে পার্‌ত। আমি কিন্তু পিতা মাতার অপরাধ সহস্র চেষ্টা ক'রেও অন্তর থেকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌লুম না। অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা নিলুম—ভাবলুম, আগুনে পুড়ে হয় খাঁটি হব—নয় পুড়ে ছাই হব। খাঁটী হ'তে পার্‌লুম না, এখন ছাই হওয়া ছাড়া আর আমার এ জন্ম থেকে মুক্তি নেই! জাহাঙ্গীর হাঁপাইতে লাগিল।

আশ্চর্য্য! চম্পা ঘৃণায় সরিয়া গেলনা। অধিকন্তু অধিকতর স্নেহে তাহার কপালের রুক্ষ চুলগুলো সরাইতে সরাইতে বলিল, লক্ষ্মীটী, চুপ ক'রে শোও! তুমিও ত রক্ত-মাংসেরই মানুষ। ভুল বড় বড় মহাপুরুষও করেন। যাঁদের জন্মে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করেনি, তাঁরাও ত সারা জীবন পাপে ডুবে রয়েছেন দেখ্‌ছি। তোমাদের অগ্নিপন্থী দলেরই নাম করা দু'চার জনকে জানি, যারা আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিল। আমি ইচ্ছা কর্‌লে তাদের সর্ব্বনাশ কর্‌তে পার্‌তাম—করিনি; ক্ষমা করেছি। বিশেষ ক'রে তোমাদের অগ্নি-পন্থীদের মনে যে ভীষণ পশু রয়েছে—তারি প্রেরণায় তোমরা হত্যা কর্‌তেও ভয় পাওনা। সেই পশু শুধু হত্যার জন্যই নয়—অন্য কারণেও ত জেগে উঠ্‌তে পারে। তোমাদের মনের পশুকে একেবারে মেরে ফেল্‌লে

তোমাদের দেবত্ব বা মনুষ্যত্ব দিয়ে আর যাই হোক্—আমাদের যে মন্ত্র যে সাধনা তার কিছু হবেনা !

জাহাঙ্গীর উঠিয়া বসিয়া চম্পার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, চম্পা, এমন কথা ত কেউ কোনো দিন বলেনি ! প্রমত্‌দা'ও না !

চম্পা বাধা দিলনা। তেমনি ভাবে বলিতে লাগিল, তবু তুমি সত্যব্রতী। তোমার পশুকে মানুষের চামড়া পরিয়ে লুকিয়ে রাখ্‌তে জাননা। অন্য যাঁদের দেখেছি, তাঁরা সমস্ত বড় কর্ম্মী ত্যাগী বীরপুরুষ, কিন্তু এই সত্যটুকু স্বীকার তাঁরা করেননি। তাঁদের দুর্ব্বলতাকে নেপোলিয়নের লাম্পট্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যদিও আমি বিশ্বাস করিনা—নেপোলিয়ন্ সে রকম ছিল !

জাহাঙ্গীর চম্পার সেই তেজোব্যঞ্জক অপরূপ রূপমাধুরী দেখিতে দেখিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে চম্পাকে সহসা বুকে চাপিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, চম্পা, চম্পা ! আমায় বাঁচাও ! হয় আমায় একেবারে রসাতলে—যে পাঁক থেকে উঠেছি সেই পাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, নয় আমায় উর্দ্ধে নিয়ে চল হাত ধ'রে।

চম্পা রহস্য-ভরা হাসি হাসিয়া বলিল, তোমায় বাধা দিব না। জানি, আগুনের তৃষ্ণা কত প্রবল ! কিন্তু কি হবে এ ক'রে ? আমার পিনাকী দা গেছে, মা গেছেন, প্রমত্‌দাও গেছেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, বজ্রপাণির দলের হয়ত একজনও আর বাইরে নেই। আমি আজ তোমার কাছে আত্মসমর্পণ না করি, কাল কর্‌তে হবে। কারণ, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার ত আর কোনো অবলম্বনই নাই। আমিও ত রক্ত-মাংসের মানুষ—আর তোমাদেরই মত পশুত্ব দিয়ে পশুকে জয় করার সাধনা আমার। লোভ তৃষ্ণা

তোমাদের কারুর চেয়ে আমার কম নেই। কিন্তু, এর যে একটা মাত্র পথ খোলা ছিল—সে পথও ত তুমিই বন্ধ করেছ।···তোমার মায়ের টাকা আছে তুমি হয়ত বেঁচে গেলেও যেতে পার—কিন্তু তাতে আমার কি? আমি কি তোমার সেবাদাসী হয়ে থাক্‌ব? জাত ধর্ম্ম আমি মানিনে, সে শিক্ষাই পাইনি জীবনে। কিন্তু আমার নারীধর্ম্ম ত আছে! তাকে আজ যদি বিসর্জ্জন দিই, কাল তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—যেমন ক'রে ভূণীকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ! তোমাকে বলতে আমার লজ্জা নেই—তোমাকে দেখেই আমার ভালো লেগেছিল। তরুণ অরুণের মত যেদিন তুমি এসে আমাদের আঙিনায় দাঁড়িয়েছিলে তোমার প্রখর দীপ্তি নিয়ে—সেইদিন থেকে তোমায় সকল প্রাণ মন দিয়ে শ্রদ্ধা করে আস্‌ছি। মরণোন্মুখ তৃষ্ণাতুর তুমি এসে দাঁড়িয়েছ—তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই—তবু ঐটুকুর বিনিময়ে আমার এমন অমূল্য শ্রদ্ধাটুকু কেড়ে নিওনা! তুমি ভূণীকে বিয়ে ক'রে সুখী হও. আমি তোমাদেরে ভগিনীর স্নেহে সেবা করব—যত্ন করব, তারপর মা. যদি ফেরেন—মার কোলে ফিরে যাব!···চম্পা সহসা কাঁদিয়া ফেলিল!

জাহাঙ্গীর চম্পাকে বুকের আরো কাছে টানিয়া লইয়া আদরে অভিষিক্ত করিয়া সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিতে লাগিল, তুমিই ঠিক বলেছ চম্পা। আগুনের আকুল তিয়াসা ত মিটবার নয়। তৃষ্ণা কেবল বেড়েই চল্‌বে। পশুর পশু-জন্ম সার্থক হয় দেবীর বেদীতলে তার বলিদান হয়ে গেলে!···জীবনে কাউকে ভালোবাসিনি, কারুর ভালোবাসা পাইনি, আজ তাও যখন পেয়ে গেলুম দৈববলে—তখন ত আমি বেঁচে গেলুম।···আমি আমার কর্ত্তব্য ঠিক ক'রে ফেলেছি চম্পা,

তোমাকে মা'র হাতে সঁপে দিয়ে—যে তুফান উঠেছে তাতেই ঝাঁপিয়ে প'ড়্ব—প্রমত্তদার মত।…

আমার যে ঐশ্বর্য্য রইল—তাতে তোমাদের এজীবনে শান্তি ছাড়া আর কোনো কিছুর অভাব হবে না। আমি আমার সকল ঐশ্বর্য্য তোমায় দিয়ে যাব। তুমি আমার হয়ে ঐ ঐশ্বর্য্য দেশ-জননীর দুঃখী সন্তান আর ভাই বোনদের বিলিয়ে দিও।

চম্পা দুই হাতে জাহাঙ্গীরকে জড়াইয়া বালিকার মত কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ যেন পাহাড় ফাটিয়া ঝর্ণা ধারার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছে।

জাহাঙ্গীর ধীর শান্তস্বরে বলিতে লাগিল, আমি জীবনে ভাবিনি—নারীজাতিকে কখনো শ্রদ্ধা কর্‌তে পার্‌ব—তাদের ভালোবাস্‌তে পার্‌ব—তাদের প্রেমে বিশ্বাস কর্‌ব।…আজ আমার কাছে এই পাপের পৃথিবীও সুন্দর হয়ে উঠেছে। আমার মরুভূমির ঊর্দ্ধে মেঘের স্বপন ভেসে উঠেছে। ফুল ফুট্‌লনা সে মরুভূমিতে—দুঃখ করিনে তার জন্য। আমার চির দগ্ধ বুক ত শীতল হ'ল!

সূর্য্যমুখী যেমন করিয়া অস্ত-সূর্য্যের পানে চায়, তেমনি করিয়া মুখ তুলিয়া চম্পা বলিল, তোমার ঐশ্বর্য্যের অভিশাপ আমায় দিয়ে যেয়োনা, ও আমি সহ্য করতে পার্‌বনা। সবাই ত আমায় ছেড়ে গেল, তুমি যেয়োনা!

জাহাঙ্গীর চম্পার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, তোমাকে ত দিয়ে যাব না ওসব চম্পা। আমার মত যে সব যুবক দেশ-জননীর পায়ে আত্মবলি দিয়ে তাদের আত্মীয় স্বজনকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে গেল, তাদের নিরন্ন মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত হবে তোমার। তুমি হবে তাদের দেবী অন্নপূর্ণা।

ট্রেণ একটা ষ্টেশনে থামিতেই চম্পা বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, ওঠ ওঠ, রাণীগঞ্জে এসে পৌঁচেছি। মাত্র দু' মিনিট ষ্টপেজ্!

নামিয়া ট্যাক্সি ঠিক করিতে আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। যখন তাহারা যাত্রা করিল, তখন রাত্রি দুইটা।

মোটর চলিতে আরম্ভ করিল জাহাঙ্গীর এলাইয়া পড়িয়া বলিল, আমার কি মনে হচ্ছে চম্পা, জান? যেন এ পথের আর শেষ না হয়! যুগযুগান্তর ধরে শুধু তোমায় পাশে নিয়ে এমনি ক'রে ছুটে চলি।

চম্পা কথা কহিল না। চক্ষু বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। কেহ আর কোনো কথা কহিল না। গাড়ী উল্কাবেগে ছুটিতে লাগিল, মোটর হাবড়া ব্রিজের মোড়ে আসিতেই চার পাঁচজন সার্জ্জেণ্ট্ গাড়ী আগুলিয়া দাঁড়াইয়া মোটর থামাইবার আদেশ করিল।

জাহাঙ্গীর ও চম্পা জ্যা-ছিন্ন ধনুকের মত সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সশস্ত্র সার্জ্জেণ্ট্-দল রিভলভার হাতে লইয়া গাড়ীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর পিস্তল ছুঁড়িতে একজন সার্জ্জেণ্ট্ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। অন্য সার্জ্জেণ্ট্গণ জাহাঙ্গীরকে ধরিয়া ফেলিল।

এই ধস্তাধস্তির ফলে চম্পা কখন্ সরিয়া পড়িয়াছিল, কেহ টের পাইলনা।

দুই তিন জন সার্জ্জেণ্ট্ ট্যাক্সি লইয়া দুই তিন দিকে তাহার খোঁজে ধাওয়া করিল।

১৯

এদিকে জাহাঙ্গীরের মাতা হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া জাহাঙ্গীর ও চম্পাকে দেখিতে না পাইয়া এবং হারুণের কাছে সমস্ত শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভূণীর মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল !

হারুণ কিন্তু যে ভয় করিতেছিল, তাহার কিছুই হইল না। কেহ তাহাদের গাড়ী সার্চ্চ করিলনা। হারুণ দেখিল, প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম মিলিটারী পুলিশে ও গোরায় ছাইয়া ফেলিয়াছে। কয়েকজন যুবককে ধরিয়া তাহারা প্রিজ্‌নার-ভ্যানে পুরিল, তাহাও সে দেখিল। ভয়ে তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল।

সে দেখিল ধৃত বন্দীদের মধ্যে জাহাঙ্গীর নাই। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

হারুণ জাহাঙ্গীরের মাতাকে জাহাঙ্গীরের উপদেশ মতই সব কথা বলিয়াছিল। সে যে বিপ্লবীদলের, সে কথা সে গোপন করিয়া গেল।

দেওয়ান সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। জিনিসপত্র গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া দেওয়ান সাহেব বলিলেন, আমি পুলিশ-কমিশনার সাহেবের কাছে যাচ্ছি। যেমন ক'রে হোক ওর কিনারা ক'রে তবে জলগ্রহণ করব।

জাহাঙ্গীরের মাতা সাশ্রুনেত্রে দেওয়ান সাহেবের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। কিছু বলিতে পারিলেন না।

মাঝে মাঝে কেবল হারুণের উন্মাদিনী মাতা কাঁদিয়া উঠিতে লাগিলেন, মীনা! মীনা কোথা গেল আমার? সে আর ফির্বেনা। আবার পালিয়ে গেল!

এত আনন্দের মাঝে সহসা যেন ঝড় উঠিয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল!

জাহাঙ্গীরের মাতা কাঁদিলেন না। ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন শান্তগম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে—তেম্নি বিষাদ-ঘন মূর্ত্তি লইয়া বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।

কাহারও মুখে কথাটী নাই। জাহাঙ্গীরের মাতা আদর করিয়া হারুণদের সকলকে বাড়ীতে উঠাইয়া সকলের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নুখরা মোমি এবং মোবারক পর্য্যন্ত কথাটী কহিতে সাহস পাইলনা।

দ্বিপ্রহরে দেওয়ান সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ চোখ দেখিয়া জাহাঙ্গীরের মাতা ভয় খাইয়া গেলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কোনো রকমে দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, দেওয়ান সাহেব! আমার খোকা?

দেওয়ান শান্তগম্ভীর স্বরে বলিলেন, বিপ্লবীদের সাথে সে ধরা পড়েছে! হতভাগ্য!...তিনি আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল!

জাহাঙ্গীরের মাতা সকালে উঠিয়াই সমস্ত সংবাদপত্র আনাইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুই দিনের মধ্যে বাঙলা দেশে যে ভীষণ ওলটপালট হইয়া গিয়াছে—তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছেন সংবাদপত্র পড়িয়াই।

জাহাঙ্গীর বলিল, ভুল করেছ মা, ও ঐশ্বর্য্যের মালিক যদি হই, তা হ'লে ঐ ঐশ্বর্য্যের ভার তারই হাতে ছেড়ে দিও। মা'র মত শত শত মা আজ নিরন্ন, তাঁদের মুখে তাঁদের সন্তানে সে অন্ন দেবে। ও ঐশ্বর্য্য এখন আমার দেশের নির্য্যাতিত বোনেদের। এবার সে এলে তাকে ফিরিয়ো না। হাঁ, ভূণীকে সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দিও।

মা কিছুক্ষণ ভাবিয়া শান্ত স্বরে বলিলেন, আচ্ছা তাই হবে! অধর দংশন করিয়া কান্নার বেগ সামলাইতে লাগিলেন।

মাতার সহিত সকলেই আসিয়াছিল। জাহাঙ্গীর হাসিয়া হ দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার কথাই সত্য হ'ল কবি, নারী কুহে হারুণ কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কেবল শব্দ নির্গত হইল, "নিষ্ঠুর!"

জেলের ভিতর পাগ্‌লা ঘন্টী বাজিয়া উঠিল। জেল হ কয়েকজন রাজবন্দী পলাইয়াছে!

স-ওয়ার্ডার জেলার আসিয়া জাহাঙ্গীরকে লইয়া চলিয়া গেল।

মাতা সেইখানে পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—খোকা! আমার খোকা!